প্রকাশক—

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র রায়

রায় কুটীর

ওল্ড ক্যালকাটা রোড,

পাতুলিয়া (বন্দীপুর)

২৪-পরগণা।

মুদ্রাকর—

প্রোগ্রেসিভ প্রিণ্টার্স এণ্ড বাইণ্ডার্স

৫৭, নর্থ রেঞ্জ,

কলিকাতা-১৭

উৎসর্গ

সাগর-প্রাং

স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার রায় ও

স্বর্গীয়া বিনোদিনী রায়ের

উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁরা, আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে [illegible], শ্রী [illegible] ভট্টাচার্য, [illegible] বিশেষ [illegible] বর্তমান [illegible] নিবন্ধকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশক

নিবেদন

পুস্তকটিতে কাহাকেও বা কোন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করা হয়নি, নিরপেক্ষ ভাবে যতটুকু সত্য তার উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। জানি না আমার এই ক্ষুদ্র লেখা কাহারও জ্ঞানের সম্মুখে আলোকপাত করবে।

যাঁরা এদেশের সমাজ-সংস্কারক, দেশের উদার-প্রাণ, প্রগতিবাদী তাদের আর যারা সমাজে লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত, নিষ্পেষিত, শোষিত, পদদলিত, দুঃস্থ তাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই আর আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শান্তি কুটীর।
৬নং কালকাটা রোড
পাতুলিয়া (খড়দহ)
২৪-পরগণা।

ইতি—
গ্রন্থকার
আশ্বিন (১৩৫৮)

পল্লী মায়ের বুকে যখন সবাই নিদ্রিত; তখন কোথা যেন এক অজানা পথিক তার গান গেয়ে ফিরছে। নিশিথে রাঙা ধূলির বাঁকা পথ সুরু করে চলেছে তার অবাধগতি। কিন্তু একজন শুধু নিশার আঁধারে জেগে আছে তার চিন্তাধারা নিয়ে আর তার জাগ্রত স্বপ্ন বয়ে।

হঠাৎ তার মন প্রাণ কোন এক অজানা আশঙ্কায় দুরু-দুরু করে সাড়া দিয়ে উঠলো। তাই কাজ বন্ধ করে সে গান না শুনে আর থাকতে পারলো না। তাই সে বাঁশের বাঁধা কুটীরের প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ালো।

দূর হতে দেখলো তার মত আর এক নিশাচর যাত্রী ভূতের মত যাচ্ছে। বোধ করি বয়স কম হলে সে ভয়েই ফিট হয়ে যেতো, কিন্তু তবু তার শরীর ঝংকার দিয়ে উঠলো। তবে কি সত্যই ভূত নয়? কিন্তু ভূতের ভয় কার না আছে? চাঁদ আবার তার অন্ধকার মেঘ কাটিয়ে তার সম্মুখে আলো অনুগ্রহ করে ধরলো। এবার মনের গতি ফিরে এলো। সম্মুখে নারিকেল গাছগুলি প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে; নিশিথের নিস্তব্ধ বাতাসে সেগুলির পাতা নাড়ছে, তাই দেখে সে ভাবলো না, আমি তো বীর! কেন ভয় করবো? ভয়ের কি আছে?

কিন্তু আর বেশী ভাবতে হলো না। সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠ সঙ্গীত আবার তাকে মুগ্ধ করে ফেল্লো। মাদুর পাতায়

সময়টুকু পর্য্যন্ত হলো না। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে কান পেতে শুনে গেলো, সেই মতোয়ারা সঙ্গীত, যে তার হৃদয়ে এক আলোড়ন এনে অভিভূত করে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল। যখন স্বর্গীয় ধ্যান তার ভেঙ্গে গেলো, তখন সে ভাবলো এ কি সঙ্গীত না অমৃত, একি দেবতা না শুধু মানুষ।

পূর্বদিকে চেয়ে দেখলো রঙীন আভা দিয়ে বিশ্ব স্রষ্টা ভোরের সূচনা করছে। কাকগুলি কা—কা করে ডাকছে। সম্মুখের দিগন্ত জোড়া কালো মাঠ লাল হয়ে জেগে উঠছে। মেঘের উপর রঙীন আভা বিস্তার করে দিগন্ত জোড়া গোটা আকাশটাই যেন রঙীন হয়ে উঠছে। গাঁয়ের চাষী লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে মাঠে চলে যাচ্ছে। সুপ্ত পল্লীকে মোরগ আর মুরগী ডেকে জাগিয়ে দিচ্ছে।

পল্লী মায়ের আদরে ছেলে বিশ্বনাথ মাষ্টারকে কে যেন পিছন থেকে ভুড়ুকি করে তার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিল। ফিরে দেখলো জোছনা রাতের পূর্ণিমার চাঁদ তাকে ডাকছে। তার নব আবির্ভাবে তার ডাকে সে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলো না। তাই বল্লো, গৌরী তুমি! আজ তোমায় যেন কত সুন্দর মনে হয়। তেমনি আর এক রূপ দেখেছি কাল—যে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আর যে সঙ্গীত শুনেছি সত্যই জীবনে তা' কখনও ভুলতে পারবো না। যে প্রেরণা আর যে শক্তি সে দিয়েছে সত্যই তা' বর্ণনারও অতীত। যখন আমি রাত্রে স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম তখন হঠাৎ দুপুর রাতে

শুনলাম এক অজ্ঞাত পথিকের সে গান। আমি বসে থাকতে পারলাম না! খাতাগুলি একপাশে রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। যতদূর শুনা যায়, শুনে গেলাম মুগ্ধ হয়ে, তারপর দিগন্তে গেল মিশে। কে জানে তার নিশানা? কে জানে তার ঠিকানা? কোথায় কতদূরে সে আছে? কেন এমনি করে ছুটেছে সে গেয়ে? সে পথিক ভিন্ন বোধ হয় আর কেউ জানে না। নদীতে যেমন জোয়ার আসে আবার ফিরে যায়; তেমনি যেন সে আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেল।

গৌরী— আচ্ছা আর তুমি যদি কোনো গান, বাঁশী বাজাই! তবে কি মন দিয়ে শুনবে নাকি? পুরুষ মানুষ এমনই হয়।

বিশ্বনাথ— না নিশ্চয়ই, তুমি যদি কখনই তবে গান গাও আমার বাধা মানতে আপত্তি কি? আর যদি না পারি তবে সেইটেই কি সহ্য আপনা কর না? যাক বাজে কথা এখন থাক। দেখো একটু না এলে দেখো। চট করে খাতাগুলি দেখে নেই। ছাত্ররা নম্বরের জন্য পাগল হয়েছে।

গৌরী— বেশ আজকে না হয় কাল দিলেই তো চলে। সারারাত্রি ঘুম হয়নি। এখন না হয় বিশ্রাম করে নাও; তা না করে এখনই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে। একের স্থলে দুই আর দুইয়ের স্থলে এক পড়বে!

বিশ্বনাথ— জ্ঞান বুদ্ধি কম কি না তাই যা' তা' বলে গেল। জান তো ছেলেরা আমাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করে, এখন

আমি যদি তাদের কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারি তবে কি সত্যই অন্যায় হবে না? লেখাপড়া কিছু শিখেছ কম, বুঝবে কি করে?

গৌরী—আচ্ছা বলতে পার কি রামকৃষ্ণ দেব যে লেখা পড়া মোটেই শিখেন নাই বলে তার জ্ঞান বুদ্ধি কি কম ছিল? তাঁ'র নাম আজ দেশ-দেশান্তরে ছড়াছড়ি। আর তাই যদি না হবে তবে কি আমিই এই ঘর সংসার করতে পারতাম? যাক্ অনেক কথা হয়েছে, এবার একটু বিশ্রাম করে নাও।

বিশ্বনাথ—সে কি? যারা কর্ম্মী তাদের আবার বিশ্রাম কেন? কাজই যে তাদের বিশ্রাম।

গৌরী—তোমার মত একরূপ ক'জন আছে। এই শিক্ষাহীন রাজ্যে তোমার মত কর্ম্মী ঘরে ঘরে যেদিন দাড়াবে সেদিন যে এ দেশের সৌভাগ্য ফিরবে; দেশে নূতন প্রাণ জেগে উঠবে।

বিশ্বনাথ—যা'ক ও সব কথা। এখন চট্ করে দু'টো রান্না করে দাও। ওদিকে যে স্কুলের সময় হয়ে এলো।

গৌরী—কেন তুমি তো মস্ত বড় একজন কর্ম্মী। একদিন ভাতের হাড়ি চুলোয় দাও না দেখি। একদিন ষ্ট্রাইক করলে আর পরের দিন পাত্তা পাওয়া যাবে না। বাহাদুরী তখনই ঘুচে যায়। উপবাস শুরু হয়ে থাকে।

বিশ্বনাথ—তবে উড়িয়া বামুনগুলি আছে কেন?

গৌরী—সেগুলি শুধু তোমাদের বিলাসের জন্য। ঝোল একদিকে আর মাছ অপর দিকে—তা' ছাড়া আর কি—।

বিশ্বনাথ—না বাবা! এযে দেখছি বুড়ো কালে রসিকতায় টেকা দায় হবে! বাল্যজীবনের খেলা আর সুরু করো না, বন্ধুর বাড়ী যেতে চাও সোজা সুজি বলে ফেল! আমার সময় নেই, আমি যেতে পারবো না। কেন ঝগড়া করে যেতে চাও? কত লোক রান্না করে খায়। আগেও পেরেছি এখনও পারবো। অভ্যাসের বস সবই। ওর কাছে স্ত্রী পুরুষ, জাত ভেদ, উচ্-নীচ্ কোনটাই খাটে না। তবে কি-না ধৈর্য্য চাই; কষ্ট হয়।

গৌরী—আচ্ছা! এবার রান্নাদের পরীক্ষা হয়েছে। এখন তোমার আমার পরীক্ষা। তুমি তোমার বিদ্যা নিয়ে থাক। আমি চল্লাম।

চলেছিলো দুটি প্রাণী একই কুটীরে; নির্জ্জন প্রান্তরে শান্তির গৃহবাসে। হঠাৎ শুভ্রনীল-আকাশে দেখা দিল এক খণ্ড মেঘ! ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো পূর্ণিমার চাঁদ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে দেখে গেল চুপি দিয়ে ধরণীর দু'টি প্রাণীর কীর্ত্তি-কলাপ। গেল বাক যুদ্ধ কিন্তু শেষ হলো না অস্ত্র-যুদ্ধ। সে নির্ভয়ে চল্লো তার অসি নিয়ে যেথায় পরস্পরের সহযোগিতায় চলেছিলো দুটী প্রাণীর এক অপূর্ব্ব জীবন; প্রাণময় ঘর-সংসার। যার ফলে উভয় প্রাণী খুঁজে পেল

না মনে শান্তি। ঘিরে ফেল্লো বিষাদের ছায়া। তাই যখন একজন অপর জনকে ছেড়ে বিদায় নিয়ে গেল আর এক জনের মিলনের প্রয়াসে, তখনই আর একজন সাথী হারা পাখী হয়ে কূল কিনারা না পেয়ে বীণা দেবীর আশ্রয় নিলেন। শুরু হলো—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।
তবে একলা চল রে!"

তবু তার মনে আসে না শান্তি। একদিনের কোলাহলময় জীবন আজ যেন তার কাছে শূন্য। কুটীরের প্রাঙ্গনে, কাননের সৌন্দর্য্যে কোথাও যেন তার মন সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। সবই যেন তার কাছে ফাঁকা লাগে। তাই ভাবলো পৃথিবী কি এতই নিষ্ঠুর। তাই অবাক হয়, যে গৃহ মুহূর্ত আগে ছিল প্রাণময়, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, স্বর্গের অপ্সরী, অপরূপ, চাঁদের মত স্বচ্ছ, ছিল সবুজ লতা পাতায় যেন সুশোভিত, কোকিলের মুখরিত সুকণ্ঠ স্বর, নদীর আনন্দ গান, সে যেন এক মুহূর্তে হয়ে গেল রূপান্তর। এক আঘাতে সব শূন্য হয়ে গেল। তাই ভাবলো এই বুঝি বন্ধন মায়াময় জীবন। তারপর বুঝি আর কিছুই থাকে না। মানুষের যৌবনের মত পরিবর্ত্তনে রূপ ও চেহারার বোধ হয় রূপান্তর ঘটে। সে কাল কাহাকেও ক্ষমা করে না, ধনী দরিদ্র সকল তার কাছে সমান, একাকার করে দেয়। তাই মনে হয় পৃথিবীটা সত্যই শূন্য। কেহ কাহার নয়। মরে গেলে কেহ কাহার থাকে না।

সবই তো কাল গ্রাস করে নেয়। তবে কেন এত মায়া, মমতা, মান, হিংসা, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সে পায় না। তবুও মাঝে মাঝে এসে ধরা দেয়— যখন প্রভাত পাখীর গান আর ভাল লাগে না, [illegible] করে মধুর শুনায় না, প্রভাত রবির অপূর্ব সৌন্দর্য ব্যর্থ হয়ে মুছে যায়; শূন্যতায় মন উন্মাদ উদাস করে দেয়, জীবন প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দেয়, অজানা বিপদের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হয়। কোথাও যেন কি গলদ আছে? তাই কখনো মনে হয় কাজটা বোধ হয় ভাল হয় নাই, আবার মনে পড়ে ভালই ত ঠিক হয়েছে।

[illegible] ফিরে [illegible] হয়ে এসেছে নদীর পাড়ের দিকে। বাগানে [illegible] মনের গতিতে। পথের ধারে দেখতে পায় সেই [illegible] গোলাপ, [illegible] ভাবে [illegible] যৌবনে [illegible] আছে, তার তো পরিবর্তন হয়নি, তবে আমার কেন হলো। তেমনি করে দাঁড়িয়ে আছে শিমুল গাছ, তার নীচের পথ দিয়ে যাচ্ছে লোকজন। তাদের আনাগোনায় সারা পথ মুখরিত। ছেলেরা নদীর ধারে ছুটাছুটি করে লাফালাফি খেলছে, মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাইকে ভক্ত ছাত্রবৃন্দ প্রণাম করে যাচ্ছে, নদীর পাড় ঘেঁসে তেমনি জোয়ারের জল দূর হতে দূরে বয়ে যাচ্ছে, কত অজানা লঞ্চ, ষ্টীমার দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছে, কত নৌকা পাল তুলে পাড়ি দিয়েছে, নদীর বুকের মত তার বুকেও কে যেন চলেছে। ক্ষণিকের জন্য দূর-দিগন্তে তাকিয়ে রইলো কিন্তু তার

পরক্ষণেই আবার সেই প্রশ্ন জাগে কেন এমন হলো? তাই আবার চেষ্টা করে তার বেদনাকে বিশ্ব-প্রকৃতির বেদনার সাথে মিলিয়ে নিয়ে ভুলে যেতে। তাই চেয়ে থাকে দূর দিগন্তের পল্লী কাল রেখায়, সাদা সাদা গাং চিলের দলে; মাঝির ভাটিয়ালী গানে দূরবর্ত্তী ষ্টীমার ঘাটের নানা হট্টগোলে ষ্টীমারের নদীর বুকের প্রতিধ্বনিতে, তবু সে ভুলতে পারে না। মনে করে পৃথিবীটা একবার ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াই, কিন্তু আবার অদৃশ্য টানে থেমে যায়।

তেমনি গৌরীরও বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসে ভাল লাগছে না, কিন্তু কি আর করবে! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, তাকে না ডাকলে সে আর যাচ্ছে না। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেও তার আর ভাল লাগে না, মনের কালিমা দূর হয় না, তাই ঠিক করলো একবার সাধুর কাছে যাই, দেখি সে কি বলে? তাই চুপে চুপে চারিদিক দেখে বনের ধারে পথ চলতে থাকে। ভেবেছিলো কেউ তাকে দেখে নাই। তাই বেশ চলছিলো, হঠাৎ পেছন থেকে বনের আড়াল থেকে বন্ধু ধরে ফেলে। সে বল্লো—কি-রে, বাড়ী থেকে বুঝি ঝগড়া করে আসা হয়েছিলো, এখন যে আবার চুপি চুপি যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। তাই তোমার ক্ষুধা নেই, ঘুম হয় না, খেলায় মন বসে না। যাই হোক শত হলেও বাবা বিশ্বনাথ তো! ব্যোম-ভোলানাথ! সব কিছু হজম করতে পারে। সে কি ক্ষমা না করে পারে, গিয়ে দেখবি ঠিক আছে।

গৌরী—যা' তো'র ছোট বেলার ঠাট্টা করার অভ্যাস এখনও গেল না।

বন্ধু—শত হলেও আমরা মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষ চিনে আর সহজে ধরতে পারে। শত ভিন্ন হলেও গ্রামের প্রতিবেশী ; উভয়ে উভয়ের মনের কথা জানি। তোকে আমি ধরে রাখবো না। একজন লোক দিচ্ছি সে পৌঁছে দিবে। কেন মিছামিছি শাক্ দিয়ে মাছ ঢাকছিস্। যেতে চাস্ সোজা ভাষায় বল, যাবো।

গৌরী—হ্যাঁ,—আমি যাবো। তবে একাই যাবো। আচ্ছা চল্লাম।

বন্ধু—যদি পাখী হতাম তবে বোধ হয় এখনই উড়ে যেতাম। ঠিক তাই না ?

গৌরী—তা তো জানিস্। আর বলতে হবে না।

বিশ্বনাথ এদিকে ঘরে ফিরে এসে দেখে সাধুজি স্বয়ং এসে বসে আছেন। ঘরে ঢুকতেই বল্লেন—কি—রে ' বিশ্বনাথ। তুই এত লোকের ঝগড়া আপোষ করিস্। আজ যে দেখছি আমাকেই তোদেরটা আপোষ করতে হবে। হ্যা, বুঝেছি তোর মন খুব খারাপ , এর উত্তর দিবিনি।

বিশ্বনাথ—আচ্ছা ! সত্যই বলতো তুমি কি মন চোর না অন্তর্যামি। কি করে এসব জানলে ।

সাধু—তোরা বলিস আমি অন্তর্যামি কিন্তু কি করি —তোরাই তো আমায় জানাস্। নইলে জানবো কি করে ?

বিশ্বনাথ—আচ্ছা! বলতো আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

সাধু—এতো সংসারের রীতি। আজ ঝগড়া হবে কাল আবার মিল হবে। এতো চিরন্তন প্রথা, এতো অনেকবার হয়েছে। এতে করেই ত বন্ধন পাকা হয়। তা' ছাড়া সে তোর জন্ম-জন্মান্তরের সাথী। সে কি কখনও ছেড়ে যেতে পারে? তোকে ভুলে থাকতে পারে? দেখনি সে সেদিন বলে! তুই আমি এক জাত, কিন্তু ওরা ভিন্ন জাত। যাকে একবার প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে তাকে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নিবে। যত আঘাত তাকে দিক সে তা' মানবে না। আচ্ছা! দেখ্ দেখি কে যেন উঁকি-ঝুঁকি মারছে?

বিশ্বনাথ লাঠি হাতে করে সেদিকে এগিয়ে যায়।

সাধু—ওরে বিশ্বনাথ! তুই বাল্যকাল থেকে যে বড় লাঠিওয়াল সে সবাই জানে। এখানে ওর প্রয়োজন নেই। সে তোর শত্রু নয়—বাল্যের বন্ধু।

কিন্তু বেশী দূর যেতে হলো না, কে যেন উঃ, মাগো! বলে চীৎকার দিয়ে ঝোপের ভিতর পড়ে গেল। বিশ্বনাথ গিয়ে দেখলো গৌরী! সে ডাক দিলো—গৌরী—! একি করলে? তাড়াতাড়ি কোলে করে বারান্দায় নিয়ে এলো, সাধুজি ও বিশ্বনাথ উভয়েই ব্যস্ত হয়ে মাথায় ও চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে এলো।

সাধু বল্লো—মা ! কেন এত খেলা করছো ! কত খেলা তো করলে, তবুও কি শেষ হবে না ? যে খেলার খেলা সাথী তাকে কি এত সহজেই ভুলতে পারবে ? তারপর দুজনের হাত ধরে মিল করিয়ে দিয়ে বল্লো—যথেষ্ট হয়েছে—আর নয়।

গৌরী—বন্ধুর বাড়ী থেকে তোমার কাছেই গিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানে শুনলাম তুমি এদিকে এসেছ, তাই আশ্রম থেকে এদিকে খুঁজে আসছিলাম, কিন্তু হঠাৎ ঝোপের ধারে কাঁটা ফুটে এই কাণ্ড হয়েছে, কাঁটা খুলতে গিয়েই পড়ে যাই।

সাধু—কেন হবে না ? এই নিরীহ বেচারীকে একা রেখে কোথায় ঘুরছিলি, ঘরে গিয়ে দেখ দেখি কি হাল করেছে। জলটল ফেলে হলুদ মরিচ দিয়ে একাকার করে রেখেছে। কোথায় তার চাল আর কোথায় তার ডাল, সব খিচুড়ী করে রেখেছে। তোদের সহযোগিতা ছাড়া কি কিছু হয় ?

বিশ্বনাথ—ডাক দিলো—ওহে পিয়ন ! আমার কিছু চিঠিপত্র আছে ?

পিয়ন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই জন্যই তো এদিকে এসেছি।

চিঠি খুলে পড়ে বল্লো—সাধুজি ! স্বপ্ন লিখেছে, এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে ওরা দক্ষিণেশ্বরে একটা ক্যাম্প করবে। তারপর বাড়ী আসবে। অথচ আমি যে এ দিকে নিশিকে সেখানে পাঠিয়েছি।

সাধু—গঙ্গার পাড়ে মা'য়ের স্থান, সত্যই জায়গাটা বড় ভাল লাগে। কিন্তু কি জানিস্, সে না থাকলে মনে হয় সারা পল্লীটাই যেন অন্ধকার হয়ে বসে। সে এলে "পল্লীশ্রী" সঙ্ঘের কাজে মাতোয়ারা হয়ে উঠে। দিকে দিকে পল্লীর সংস্কারের সাড়া পড়ে যায়। শ্রীবৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ছেলেরা খেলা ধূলায় সবটাতেই প্রাণ পায়। ওর মত ছেলে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্য।

গৌরী—আপনি কি সব বলছেন?

সাধু—হ্যাঁ। যা বলছি সব সত্যি, যে স্পর্শে লোহা সোনা হয় সেই স্পর্শ ওর গায় লেগেছে। সে কি কখনও ব্যর্থ হয়।

গৌরী—তাই যেন হয়।

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে ঠিক হলো একটা উদ্ভিদ বিভাগ প্রদর্শনী কলেজে করা হবে। উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ আয়োজনের ভার নিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বল্লেন—তোমরাই ইহা গুছিয়ে সফল করে তুলবে। আমি শুধু তোমাদের সঙ্গে থেকে দেখাশুনা করবো। দেখবো তোমরা কে কত স্বাবলম্বী হতে পার। আর আগামী রবিবারের ছুটিতে সহরের অথবা নিকটস্থ বাজার হতে যে যত পার অদ্ভুত রকমের ফল আর গাছ সংগ্রহ করে আনবে। যে যত রকম অদ্ভুত ফুল, ফল, গাছ সংগ্রহ করে আনতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া

হবে। যার প্রদর্শনী ভাল হবে এবং ভাল ভাবে দেখাতে ও বুঝাতে পারবে তাকেও পুরস্কার দেওয়া হবে। আর কলেজের যতরূপ আঁকান ছবি আছে তাও তোমরা পাবে। তা ছাড়া এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে তোমাদের নিজেদেরও উৎসাহের মধ্যে শিক্ষা হবে; অপর লোকও কিছুটা জানতে পারবে।

স্বপন—স্যার! এ [illegible] হলো!

পাপড়ী—শুধু তাই নয় এক [illegible] মারা

অশোক—হুঁ। তাই [illegible] মক্ষিকা
[illegible] সঙ্গে
[illegible] বুলে
ছড়িয়ে পড়ে [illegible] শঙ্কর
[illegible] ঠিক
নাই, তাড়াতাড়ি [illegible] এখন
থেকে [illegible] যাবে।

ছুটি হয়ে গেল। [illegible] পাপড়ীকে বললো—দেখ পাপড়ী! যদি [illegible] চাও, তবে তোমাদের মটর নিয়ে বিকালে [illegible] আজাদ হিন্দ পার্কে চলে এসো, সেখান থেকে আমার [illegible] খানা বড় হাটে গিয়ে সব সংগ্রহ করে আনবে। দেখবো আমাদের পুরস্কার কে নেয়?

পাপড়ী—আচ্ছা তাই হবে।

স্বপ্ন হোষ্টেল থেকে পার্কে এসেই দেখে পাপড়ী মটর নিয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর দু'জনে গ্রামের দিকে নানা বাজার ঘুরে অনেক অদ্ভুত জিনিষ সংগ্রহ করে ফিরে এলো। তারপর দু'জনে সমান ভাগ ক'রে যার যার গন্তব্য স্থানে চলে এলো। নির্দিষ্ট দিনে প্রদর্শনী শুরু হলো, সবাই তাদের সংগ্রহ দেখে অবাক! বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করছে—ওহে স্বপ্ন! অদ্ভুত অদ্ভুত এ সব চিহ্ন কোথা থেকে জোগাড় করে আনলে? নিশ্চয় খুব খরচ করেছ?

স্বপ্ন— কেন! গ্রাম থেকে এনেছি, খরচ তেমন কিছুই না। শুধু যাতায়াতের খরচ। তা'ছাড়া অনেককে চাইতেই মূল্য ছাড়াই দিয়েছে।

ভুতু— বাঃ! এ দেখ্ছি দাতাকর্ণের দেশ।

স্বপ্ন— তা'না হ'লে ও তার চেয়ে কম নয়। যারা সহরের কৃত্রিমতায় ডুবে আছে। বাজার সরকারের উপর ভার দিয়েই খালাস, তারা পল্লীর কি খবর জানবে? তাদের কাছে এটা কল্পনা-বিলাস।

পাপড়ী—ভুতু বাবু! আমার সংগ্রহের ভিতরেও এর অনেক দান আছে। নয়তো অনেক খরচ পড়ে যেতো। তা'ছাড়া এ সব জিনিষ পাওয়াই যেতো না।

ভুতু— বাবা! এদিকেও দেখছি এক ঢিলে দুই পাখী।

স্বপ্ন— তা'তে ক্ষতি কি?

ভক্ত— বেশ ভালই। মন্দ কি?

প্রদর্শনী সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহরের নানাদিক থেকে দলে দলে বৃদ্ধ, যুবা, শিশু অগণিত আসতে লাগলো, একের পর এক দেখে যাচ্ছে। প্রত্যেকের মন আকৃষ্ট হচ্ছে স্বপুর সংগ্রহের দিকে। নানা রকম অদ্ভুত প্রশ্ন হতে পারে যে তাতে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে, স্বপু তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, সব চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ যে লজ্জাবতী গাছ ছাত্রেরা পুস্তকে পড়েছে, তাই স্বপু অনেক গুলি সংগ্রহ করে, সঙ্গে এনেছে প্রদর্শনীতে। কেউ কৌতুকভরে গাছে স্পর্শ করে যাচ্ছে। আর অমনি যে পাতায় পাতাগুলো অবনত করে নিচ্ছে যে যেন সদ্য বিবাহিত কুল বধূ। তাই দেখে ছোট ছোট মেয়েরা প্রচুর আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যত লোক আসছে আর যাচ্ছে তার অধিকাংশ লোক ভীড় করছে স্বপু আর পাপড়ীর কাছে তাদের বলার ভঙ্গিতে ও সংগ্রহে কে না শুনে তার দেখে? এমনকি অন্যান্য প্রদর্শকগণও শেষে তাদের প্রদর্শনী দেখানো দূরে থাকুক, জনতার সঙ্গে ভীড় করে তাদের প্রদর্শনী দেখছে। সব শেষে অধ্যক্ষ মহাশয় খুব সন্তুষ্ট হয়ে স্বপুকে প্রথম পুরস্কার এবং পাপড়ীকে দ্বিতীয় পুরস্কার দান করলেন, ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় তাদের ছবি বেরুলো। তারপর কলেজ যখন বন্ধ হয়ে এলো, তখন কতিপয় উৎসাহী যুবক যুবতী অধ্যক্ষের নিকট গ্রীষ্মের ছুটিতে একটি ক্যাম্প করবার প্রস্তাব

করলেন। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হলো সহরের সব চেয়ে নিকট স্থান দক্ষিণেশ্বর গঙ্গার ধারে করা হবে।

গঙ্গার ধারে পবিত্র বনভূমিতে একটা স্কুল গৃহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হ'তে আবেদন করে পাওয়া গেল। ক্যাম্প যাত্রীরা তল্পি-তল্পা নিয়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে শিয়ালদহ থেকে গাড়ীতে উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ পরেই দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে গেলো। প্রত্যেকে নিজের নিজের জিনিষ পত্র কাঁধে করে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট কামরায় হাজির হলো। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের পরিচয় নিয়ে নিলেন আর স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। খাটিয়া ঠিক-ঠাক করে, আসবাব পত্র গুছিয়ে সবাই দৌড়ে এলো চায়ের আসরে. পূর্ব্বেই কয়েকজন ছাত্র এসে সব প্রস্তুত করে রেখেছিলো। ঠিক হলো এই চা'য়ের আসরে নিজেরাই নিজেদের কাজ ঠিক করে নিবে এবং করবে। অধ্যক্ষ মহাশয় বল্লেন—এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য অনেক। প্রথমতঃ স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ নিয়মানুবর্ত্তীতা তারপর পল্লী জীবন উপভোগ, পরস্পরের বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া ও পরিচয় জানা। তারপর মেয়েরা অনেকে রাজী হলো রান্নার কাজ নিতে। ছেলেরা হাট-বাজার, খেলাধুলা, বিতর্ক গান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কাজ নিতে রাজী হলো। চায়ের আসর শেষ হয়ে এলো। আসর ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে পাকশালার সম্পাদক পাঁপড়ী বল্লো—অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে বলছি—যারা আমিষ এবং যারা নিরামিষ তারা যেন রাত্রির আহারের পূর্ব্বে নিজ নাম দিয়ে যান।

স্বপ্ন—(দাঁড়িয়ে বল্লো) স্যার! আমি সপ্তাহের দু'তিনটা দিন আমিষ আর বাকী দিন হলো নিরামিষ খাই।

অধ্যক্ষ—তা' বেশ তো! যখন বা যেদিন আমিষ বা নিরামিষ নিবে তার পূর্ব্বেই পাপড়ীকে জানিয়ে দিবে।

স্বপ্ন—আচ্ছা, স্যার! তবে আজকে প্রথম দিন কিনা তাই নিরামিষ থেকেই সুরু করি।

অধ্যক্ষ—তুমি কি আমার মত সন্ন্যাস নেবে নাকি হে? দেখছি তুমিও আমার মত।

আসর ভেঙ্গে গেল। স্বপন নামক একটা ছেলে বল্লে—ওরে ভুতু! আমাদের স্বপ্নও যে বিধবা হতে চল্লো।

ভুতু—সে কি-রে বিয়ে না করেই।

স্বপ্ন—হাঁ! আজকাল এমন হয়েছে যে বিধবারা তো আছেই সধবারাও নিরামিষ খাচ্ছে। খরচ কম কিনা, তাই।

স্বপন—কিন্তু এবার যে আমাদের এ আমিষ আর নিরামিষের মাঝখানে পড়েই প্রাণটা যাবে।

স্বপ্ন—ভয় নাই! এখানে অনেক ডাক্তার আছে। তা'ছাড়া কাঠের অভাব হবে না, পোড়াবার জন্য বনের অনেক কাঠই পাওয়া যাবে।

ভুতু—ওরে স্বপন! জানিস্ না সে যে জাতে খাট। এবার উঠতে চায়। জানে না তর্ক সে আবার হয়েছে বিতর্কের সম্পাদক। তারপর আবার নিরামিষ বলে নাম জাগান হচ্ছে।

স্বপু—কেন যত লোক আছে সবাই যদি হাত ধরে দাঁড়াই তবে বোধ হয় সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যাবো। জাতটা তখন তোমার চেয়ে অনেক বড় লম্বা হয়ে যাবে। তা'ছাড়া আমাদের মধ্যে যে এতবড় দিগগজ এতবড় পণ্ডিত আছেন তা জানলে আমিই অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট বিতর্ক সম্পাদক করার জন্য তোমার নাম প্রস্তাব করতাম, সত্যি আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কোনই হদিস নাই। তিনি এত বড় পণ্ডিতের খবর রাখেন না। সত্যি দুর্ভাগ্য।

অধ্যক্ষ অন্যত্র কাজে চলে গেছেন। ছাত্রছাত্রীর দল তাদের তর্ক শুনছিলো, শেষে পাপড়ী বল্লো – স্বপ্নবাবু এ সম্বন্ধে এখনই আপনার কিছু বলা দরকার এবং আমরা শুনতে চাই।

স্বপু—আপনারা হয়তো শুনে কেউ দুঃখ পাবেন কেউ হয়তো হাসবেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি যা আছি তাই থাকবো। দেখুন আজ যারা দেশের সব চেয়ে অর্থহীন গরীব, যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তারা পর্য্যন্ত শাকান্ন রুচি ভেদে বদল করে নেয়, যেহেতু বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি। তাই তো আমাদের প্রকৃতিও বৈচিত্রময়। তার বৈচিত্র আছে বলেই না দেশের অনাথা ভিখারীর দল আজও বেঁচে আছে। নয়তো কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। ভাল মন্দ কোনটাতে না আছে? যাদের আপনারা ছোট

বলে জানেন তাদের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। তারা সমাজের একটা বিরাট অংশ নিয়ে আছে। তাদের অবহেলা করে চলা যায় না, তাদের বড় করেই বড় হওয়া যায়; তাদের ছোট করে নয়। তাদের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায় যারা একটু সুযোগ সুবিধা পেলে অনেক উন্নত হতে পারে—দেশের বরণীয়ও হতে পারে। তারা বুদ্ধি ও কৌশলে চের চের বেশী গুণী; লম্বায় ঢের বড়; অনেক শক্তিশালী, তাছাড়া যাদের আপনারা অস্পৃশ্য, ছোট জাত বলে সুদূর পল্লীতে ঠেলে দেন, রাখেন পল্লীর অন্ধকারে; তারা আপনাদের অনেক কাজ ক'রে দিয়ে যায়। আবার যখন আব-হাওয়ায় নগরীর সভ্যতা অসভ্যতায় পরিণত হয়, তখন কি তাদের হাত ধরতে হয় না, তাদের ডাক পড়ে না, তাদের পিছু দৌড়াতে হয় না। কিন্তু তবু তারা দুঃখ কষ্ট অপবাদ নিয়েও হাসি মুখে, সবল প্রাণে, সরল বিশ্বাসে দিনের পর দিন আপন মনে কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনারা তার প্রতিদানে দেবেন হিংসা, অপমান, ঘৃণা। আজ যদি বিদেশের মত বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করা যায়, কাজ করা যায়, তাদের যদি শিক্ষা, সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় ও তাদের ভালবাসতে পারেন তখন তারা নানাদিক থেকে সমাজের কত কাজ আনন্দে করে চলে যেতে পারে, কত সাহায্য

সহযোগিতা পেতে পারেন। যার ফলে দেশ কত এগিয়ে যেতে পারে কত শক্তিশালী হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে যুগ যুগান্তর ধরে তারা অন্ধকারে ডুবেছিলো তা একদিনেই দূর করা সম্ভব হবে না। আবার তাদের যুগ-যুগ ধরে শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যাতে করে সমগ্র দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন হতে পারে। যাতে সবার সাথে হাত ধরে সমান ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। দেশটাকে যদি কমলা লেবু ধরা যায় আর তার যদি কতকাংশ পচা থাকে তবে কি সেটা লোকে নিতে চায়, লোকে তাকে কি ভাল বলে? তা নয় তবে যাতে ভাল থাকে, যাতে পচতে না পারে তার ব্যবস্থা তখন করতে হবে। তাই একটা দেশকে ভাল করতে হলে চাই তার সর্বাঙ্গ উন্নত করা। তাই যখন বিশ্বকবির "অপমান" শরৎচন্দ্রের "হরিজন পল্লী" "মেথর" কাহিনী পড়বেন তখন দেখবেন কবিরা দেশের কতটা দুঃখ অনুভব করতে পেরেছিলেন—যার ফলে বলেছিলেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
যাদের করেছ অপমান,
অপমান হতে হবে তাদের সমান।"

তাই একজনকে বড় করতে পারলেই বড় হওয়া যায়; ছোট করলে নিজেরই ছোট হতে হয়, অপমান করলেই নিজেরও অপমান হতে হয়। আজ দেশের শ্রেণী বিন্যাস

ভালোর চেয়ে অনেক বেশী করেছে খারাপ। ভারতের এক জাতি এক প্রাণ একতা আজ কোথায়? তাই দেখতে পাই দেশের যতটা জাত ততটা তার ভাগ, তাই কারো সঙ্গে কারো নাই মিল, নাই একতা, যার ফলে দেশের বিপদের দিনে না মিলে সহযোগিতা, না মিলে সাহায্য। যে বৈদিক যুগে ছিল চারি বর্ণ, সেখানে আজ এসেছে হাজার হাজার জাত। এই যে জাতি ভেদাভেদ এ দেখছি ইংরাজ জাতির ভেদাভেদ নীতি হতেও মারাত্মক। বল্লাল সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জাতিভেদ করে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে। তার সংশোধন আজ কোথায়? যে বৈদিক যুগে জ্ঞান লাভ করে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারতো, আবার ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকর্ম না করলে ব্রহ্মজ্ঞান না পেলে শূদ্র হয়ে যেতো। সেখানে আজ একচেটিয়া কারবার। যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়ে বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রাহ্মণ হয়ে যায় সেই বৈদিক সাম্যবাদ আজ কোথায়? সে গণতন্ত্র কোথায় উঠেছে? যারা বলে — "জন্মনাৎ জায়তে শূদ্র, সংস্কারাৎ দ্বিজ।
বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্র, ব্রহ্মজ্ঞানাতি হি ব্রাহ্মণ॥"
আজ তারা কোথায়?

যখন স্বপুর বলা শেষ হয়ে গেল তখন ভুতু বল্লো—দেখরে রূপন! যে বক্তৃতা আজ দিলে এরকম সুরু হলে আর এখানে

টেকা যাবে না। সব কাত হয়ে যাবে। বিতর্ক সম্পাদক উপযুক্তই বটে, ছোট নয় মস্ত বড়।

রূপন—তা না হলে খোঁচা দেব কেন ?

পাপড়ী—ও সেই জন্যই বোধ হয় দেওয়া হয়েছিলো। তবে কি আরও শুনবার ইচ্ছা আছে না কি ?

ভুতু—না বাবা! এবার আর শ্রাদ্ধ নয়, যা হয়েছে তাতেই কাশীবাস হয়ে গেছে।

পরদিন দুপুর বেলা ভোজনের আসরে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে আজ বিকেল বেলায় ছাত্রদের মধ্যে থেকে একটি গানের জলসা করা হবে। যারা যে সব গান দিতে চান তারা যেন নাম পাঠিয়ে দেন।

ঘোষণার পর সকলেই বলাবলি সুরু করলো, আধুনিক গান ছাড়া আজকাল আর বাজারে নাম করা যায় না। সমালোচকদের কথাই ঠিক হলো, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আধুনিক গানেরই গায়ক বেশী নাম দিয়েছেন। অন্য গানের গায়ক তেমন কেহ নাম দিলেন না। গানের আসর সুরু হলো। একের পর এক আধুনিক গান হয়ে যাচ্ছে। সকলেই বাহবা হাতে তালি দিতে লাগলো। মেয়েদের মধ্যে সুখ্যাতি হলো পাপড়ীর। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে যার পাবার কথা সে পেল না। তাই যখন স্বপু গান সুরু করলো, তখন রূপন ও তার দলবল নিয়ে তার ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে ব্যঙ্গ সুর সুরু

করলো। নানারূপ ব্যাঙ্গ ডাক আর চীৎকার হলো। অধ্যক্ষ বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও যখন শুনছিলো না তখন গান থামাতে বলে উঠে দাঁড়ালেন, আর বল্লেন—এখানে আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং ভদ্র ঘরের। কাজেই দুর্নাম হলে বড়ই দুঃখের বিষয় হবে। তা' ছাড়া কলেজের দিক দিয়েও কম দুর্নাম হবে না। যাতে কলেজের সুনাম হয় তাই প্রত্যেকেরই করা উচিৎ। জনসাধারণ ও ছাত্রদের কাছে এই আমার অনুরোধ তারা যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ গোলমাল না করেন। তা' না হলে আসর বন্ধ রাখতে হবে।

স্বপন—স্যার, আমরা কেহই গোল করি নাই। বাইরের লোকজন করেছে।

জনতা—বারে! ঠাকুর ঘরে কে রে? আজ্ঞে আমি তো কলা খাই নি, ন্যাকামি হচ্ছে! নিজে তো কিছুই গাইতে জানেন না, তারপর আর এক জনেরটা পণ্ড করা হচ্ছে! দেখুন ভাল চান তো বাইরের লোকের বদনাম দেবেন না। আপনাদের ওখান থেকেই গোল হয়েছে।

অধ্যক্ষ—যেখান থেকেই হউক, আপনারা শান্ত হউন।

জনতা—আসরের গান সুরু করুন। আর গোল হতে দিব না।

স্বপ্ন আবার তার ভাটিয়ালী সঙ্গীত অপূর্ব সুরে গাইতে সুরু করলো, সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো, তার সাথে মনে হলো যেন সেই পদ্মা নদীর ধারে ফিরে এসেছে!

বাল্যকালের জীবন-স্মৃতি তার সম্মুখে ভেসে উঠলো। জনতা বাহবা! কি সুন্দর! অপূর্ব প্রভৃতি প্রশংসা না করে পারলো না।

তারপর আসর যখন শেষ হয়ে গেল, অধ্যক্ষ দাঁড়িয়ে পাপড়ী ও স্বপুর যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং উপস্থিত প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

তারপর মাঠের উপর দিয়ে যে যার স্থানে ফিরে চল্লো। পাপড়ী স্বপুকে ডেকে বল্লো—স্বপবাবু! সত্যাই আপনার গান এত সুন্দর, এত মধুর, এত প্রাণ মাতানো তা তো জানতাম না। পল্লীর ভাবধারা অদ্ভুত হয়ে ফুটে উঠেছে আপনার গানে! সত্যাই এমন সুর কোথায় পেলেন? আপনার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না।

স্বপু—আমার গানের সখ ছোট বেলা থেকে। পদ্মার তীরেই ছোট বেলা থেকে মানুষ। তার আবহাওয়ার গুণ আজও আমার শরীরে রয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে পারিনি। যেখানে সেখানে আপন মনে গুন্ গুন্ করে গেয়ে ফিরতাম, তাই আসরের অভিজ্ঞতা বোধ হয় এই প্রথম। তা ছাড়া আপনার গানও তো কম প্রশংসার নয়।

পাপড়ী— আমার মনে হয় আপনার গান যেন আরও উর্দ্ধে।

স্বপু—সেকি! আপনারা ব্রাহ্মণ আপনাদের উপরে কি উঠা যায়? তা' ছাড়া আমরা তো ছোট জাত।

পাপড়ী—কেন? আপনি কি ব্রাহ্মণ নন?

স্বপ্ন—দেখে কি মনে হয়?

পাপড়ী—দেখে তো মনে হয় ব্রাহ্মণ।

স্বপ্ন—হ্যাঁ! ব্রাহ্মণই বটে তবে নমঃব্রহ্ম। যাদের নমশূদ্র বলেন।

পাপড়ী—আপনি নিজে হয়তো বলে ক্ষুণ্ণ হবেন। কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। মানুষের অধিকারের পরিচয় তার গুণ ও কর্মে, কাজেই তার জাতির পরিচয় ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নয়। এই ভেদাভেদ কৃত্রিম, মানুষেরই সৃষ্টি। বিধাতা কাহাকেও ছাপ দিয়ে পাঠান নি, মানুষ জাত হিসাবেই পাঠিয়েছেন। জাত দিয়ে বিচার করা যায় না। প্রাণ দিয়েই প্রাণ বিচার করা চলে।

পথে তপন ও ভুতু দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তপন ভুতুকে ডাক দিয়ে বললো—ওরে ভুতু! পাপড়ী যে দিন দিন উড়িয়ে চলেছে। তাকে আর পাত্তা দেওয়া গেল না। কথায় বলে গোয়ালের ভুত গোয়ালেতেই ভাল বলে। তার চেয়ে ওসব শুনে কাজ নেই। চল যাই ঐ পেয়ারা বাগানে। সেখানে দু'টো পেলে পেট ভরবে।

পাপড়ী ঘরে ফিরে এলো, দেখলো সম্মুখে দিগন্ত মাঠজোড়া জোছনারাতের উজ্জ্বল আলোরাশি আর নির্মল নীলাকাশ। গঙ্গার ধারে জনরবের আনাগোনা। জলরাশির কলকল

ধ্বনি হঠাৎ মনটা উদাস করে দিলো। ঘরের বারান্দায় আসতেই দক্ষিণা হাওয়া তার দোল দিয়ে গেল। গাছ পালা গুলি সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। ঝরাপাতার মর্মর ধ্বনি কানে এলো, বন্ধুরা তাকে নানারূপ প্রশংসা করে যার যার কামরায় ফিরে গেল। কিন্তু তবু যেন তার মন কিসের জন্য যেন উদাসি হয়ে আছে। কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিলো না। দূর আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে শুধু চাঁদ তার শুভ্র জোছনার রূপ নিয়ে হাসছে। আঁধারের এই নির্জ্জনতার মাঝে আজ যদি শুধু আর একজন থাকতো তা হলে আরও কতই না মধুর হতো। চাঁদের শোভা দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে অজানতে দূর দিগন্তে স্বর্গীয় আবাসে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোর বেলা অধ্যক্ষ ঘুম থেকে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই নিকটস্থ বাগানের উড়িয়া মালী নালিশ জানালো যে তার ছাত্রেরা বাগান হতে সমস্ত পেয়ারা চুরি করে খেয়েছে। শুনে অধ্যক্ষ মহাশয় অবাক। তারপর সবাইকে একে একে ডাক দিলেন। মালী ভুতু আর রূপনকে দেখেই বল্লো—বাবুজী! এই দুই জনই গাছে ছিল। এদের আমি দেখেছি।

অধ্যক্ষ—ভুতু ও রূপন! সত্যই বল তোমরা পেয়ারা খেয়েছ কি না?

ভুতু—স্যার! আজ্ঞে আমরা তো পেয়ারা খাইনি। শুধু আমাদের ক্ষুধাটা পেয়েছে; তার বদলে পেয়ারার সখ কি না।

অধ্যক্ষ—ফের ইয়ারকি হচ্ছে। আচ্ছা ক্ষুধাটা কি তোমার না আমার?

রূপন—আজ্ঞে! আমাদের পেটের।

অধ্যক্ষ—ওহে মালী! এই তোমার পেয়ারার দাম দু'টো টাকা নিয়ে যাও। আর অন্য কারো কাছে একথা বলে বদনাম দিও না।—মনে কর এরা তোমার ঘরের লোক। ছেলে পিলে করেছে বলে মনে ধরো না।

ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বল্লেন—দেখ তোমরা এসেছ এখানে বেড়াতে এবং চরিত্র গঠন করতে। লোকে লেখাপড়া শিখে তার শুধু জীবিকা বা চাকুরীর জন্য নয়। তার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ চরিত্র গঠনের জন্য, আর মানুষ বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য। সাবধান ভবিষ্যতে যেন আর একপ নালিশ না শুনতে হয়।

তারপর দুপুর বেলা আহারের বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে, আজ বিকাল বেলায় মিশনের অনেক বক্তা হিন্দু ধর্ম ও জাতিভেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।

চুপেচুপে ভুতু বল্লো—হ্যারে রূপন আজকে আর বাঁচা যাবে না, আমাদের শ্রাদ্ধ করে ছাড়বে। যতসব জোগাড় করছে ঐ স্বপু। ওরই এ সমস্ত কাজ। ওকে শায়েস্তা না করতে পারলে আর শান্তি নাই।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বক্তা সুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা—তিনি বল্লেন হিন্দু বলতে আগে যারা সিন্ধুনদের তীরে বাস করতেন তাদেরই

বুঝাতো। যারা বেদ ও তার ক্রিয়াকর্ম মানে তাদেরই সেই দলে ধরা হতো। নির্দিষ্ট কোন সীমায় বা গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না, সেই সময় যে সাম্যবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভেদাভেদ ছিল না, প্রত্যেকের সঙ্গে বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বারা সদ্ভাব বজায় থাকতো। যার ফলে অনেক প্রতিভার এবং শঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই ব্রাহ্মণ হতো না। তার গুণ ও কর্মানুযায়ী শ্রেণী ভাগ হতো, জন্ম হওয়ামাত্র প্রত্যেকে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হতো, তারপর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ব্রহ্মা-জ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতো। সেই ছিল তাদের গণতন্ত্র আর সাম্যবাদ। তারপর সমাজে শুরু হয় অবনতি। কৃত্রিম ভেদা-ভেদ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। যার ফলে হিন্দুর হাড়িতে ছুৎ-মার্গ ঢুকে আর ভেদাভেদ্ অস্পৃশ্য শব্দ আবিষ্কার হয়। তার জন্যই পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ সংস্কারের আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। তারা আবার শিক্ষা দিতে শুরু করলেন মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালবেসে তার মঙ্গল কামনা করতে। এক মানব জাতি বলে সম্মুখে অগ্রসর হতে। তাই-তো স্বামীজি বল্লেন—

"বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি
—কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন,—
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আজ যে স্থানে আমরা আছি। ভেবে দেখুন সে কত বড় এক আদর্শ জগতের সম্মুখে। যে ধ্বনি তুলেছিলে মানব সমাজে

মানুষকে এক [illegible], [illegible] করতে চেয়ে ছিলো তাঁর [illegible]। [illegible] তা সফল করার [illegible]। [illegible] করে এক-যোগে [illegible] এক যুগ যুগান্তরের [illegible] শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, [illegible] মত মহান ব্যক্তি-দের চেষ্টাতেও [illegible] হলো না। আজকে কি আমরা পারবো? তাঁরা [illegible] সমাজ সংস্কার করে গেছেন সেই অবস্থায় [illegible] পেতাম না। মনে হয় [illegible] হয়ে আছে [illegible] রক্ত দানেই মুক্ত [illegible]। [illegible] আরও অনেক রক্তের প্রয়োজন [illegible] পর প্রাণ দানে [illegible] কারা-গার ভেঙ্গে নূতন আলোকের সৃষ্টি করে দিতে পারবে। সমাজকে স্রোতস্বিনী নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে অবাধ রক্তের মিশ্রণ দ্বারা নূতন জগৎ গড়তে পারবে। সেই ধরণের সমাজ সংস্কারক আজ প্রয়োজন। যার ফলে গড়ে উঠবে নূতন এক মহাজাতি।

বক্তৃতা শেষে প্রশ্ন করার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হলো।

স্বপু—জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা স্বামীজি যারা আজও অশিক্ষিত অন্ধকারে মগ্ন তারা কি করে সমান ভাবে চলবে?

উত্তর—তাদের নানারূপ সুযোগ সুবিধা রাজনৈতিক, সামাজিক,

অর্থ নৈতিক সব বিষয়ে দিতে হবে। যাতে করে সমাজে অবাধে মিশবার সুযোগ মিলবে! অভাব অভিযোগ শুনবে, একে অন্যের জন্য স্বার্থ বলি দিবে; তা' না হলে শ্রেণীহীন সমাজ কি করে এক তালে চলবে। তা' না হলে তেমনি অন্ধকারে ডুবে থাকবে; তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়ের মুখে আপনা থেকে চলে যাবে। সমান ভাবে চলতে হলে তাদের সমান করে নিতে হবে।

রূপন—স্বামীজি! আপনি যে সাম্যবাদের কথা বলছেন! তাতে সরকার যে কমুনিষ্ট বলে ধরে নিয়ে যাবে।

স্বামীজি—যে যাই বলুক তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যেই সেই থাকবো, তেমনিই আছি। সত্য কথা বলবো তাতে ভয় কি? কথায় বলে—

"বাজার মে হাত্তি চলে কুত্তা ভুকে হাজার
সাধুকা দুর্ভাব নাহি যবে নিন্দে সংসার।"

ভুতু—আপনাকে যদি জেলে পুরে?

উত্তর—যদি নেয় তাতে ভয় কি? লোকে শ্বশুর বাড়ী বলেও সখ করে যায়। আমি না হয় তাই যাবো। ভয় করলে তো কাজ চলবে না। শক্তি সাহস নিয়ে কাজের সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে।

সভা শেষ হলে গেল, যার যার গন্তব্য স্থানে ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎ স্বপুর সঙ্গে পাপড়ীর দেখা হওয়াতেই পাপড়ী জিজ্ঞাসা করলো—কি আজকের কথা গুলো কেমন লাগলো?

স্বপু—আপনারা তো জানেনই আমার ভাল লাগবে। তা আর জিজ্ঞাসা কেন? তারপর আপনার মন এত খুসি কেন? তাই-তো আশ্চার্য্য বলে মনে হয়।

পাপড়ীর বন্ধুরাও বল্লো—হা স্বপু বাবু! ওর মনটাই আজকে দেখ্‌ছি সবচেয়ে প্রফুল্ল।

স্বপু—তা' হলে ব্যাপার মোটেই ভাল নয়।

পাপড়ীর বন্ধু—আচ্ছা স্বপু বাবু আপনি জাতি ভেদের বিরুদ্ধে এত উঠে পড়ে লাগলেন কেন?

স্বপন—আরে! এও জানেন না, উনি যে নিজেই খাট।

স্বপু—আচ্ছা আসুন দেখি মেপে দেখি কে খাট কে লম্বা?

পাপড়ী—এ যে দেখ্‌ছি স্বপু বাবুই লম্বা।

স্বপু—দেখুন জাত আমাদেরই গড়া। কেউ আমাদের কোন ছাপ শরীরে দিয়ে পাঠান নি। আজ ভাবুন পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যারা সেবা করবে যারা চাকুরী করবে তারাই শুদ্র হবে। আজ দেখ্‌ছি সবাই তা' করে। তবে সেই অনুযায়ী দেখছি সবাই শুদ্র। তাই যদি হয় তবে কেন আমরা হিংসা-দ্বেষ ভুলে এক হয়ে দেশ সেবা করিনা? তাই দেখি আজ কোন জাত কোন জাতের পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না, আমরা কথায় বলি আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু, কিন্তু কোথায় তা মানি। আজ যে কৃষক চাষ করে তাকে ছাড়া দেশ বাচতে পারে না, সে দেশের প্রাণ। দেশের খাদ্য যোগায়, দেশের

মেরুদণ্ড। তার সাথে সহযোগিতা না থাকলে সে না বাঁচলে দেশ [illegible] না। [illegible] দেশ রক্ষা করে তাকে ছাড়াও [illegible] পারে না। আর যে বুদ্ধিজীবি তাকে ছাড়াও দেশ শাসন চলে না। তাই আজ [illegible] উদ্ভিদ জগতে দেখা যায় [illegible] ছোট ছোট [illegible] বড় বড় গাছের সাহায্যে [illegible] বৃহৎ বৃহৎ [illegible] নিতে চায় না। [illegible] মানুষ। [illegible] পারে, তাই যদি [illegible] আমাদের হয়, তবে প্রয়োজন সমস্ত [illegible] তাই এই ভারতের বুকে [illegible] চার হাজার বছর পূর্বে [illegible] সিন্ধু ও [illegible] দারোতে। [illegible] সম্রাট [illegible] চতুর্দিকে [illegible] সমগ্র বিশ্বের [illegible] দীপ্তি [illegible] আমাদের গৌরব। সে কি আমাদের নয়? সেই পূর্ব গৌরব আবার কি অশোক চন্দ্রের মত ভারতের [illegible] উঠবে না? কে ভেবেছিল যে দুর্দান্ত চণ্ড অশোক ভারতের আদর্শ সম্রাট হয়ে দাঁড়াবে? মুরা নাম্নীয় শূদ্র বংশজাত

চন্দ্রগুপ্তের বৈচিত্র্যময় জীবন চাণক্যের সহযোগিতায় সফলতা লাভ করবে, এক নূতন ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করবে। সত্যই কি আশ্চর্য্য নয়? যার ফলে শুধু ভারত নয়; সমগ্র বিশ্ব সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে মিলিত হয়েছে।

আগের দিনে শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেকের ভিতর একটা মধুর মিলন ছিল। পরস্পর পরস্পরকে দাদু, ভাই নানারূপ সম্বোধন করে গ্রামের কৃষকদেরও আপন করে নিতো। সে ডাকে থাকতো ভিতরে অশিক্ষিত শিক্ষিত উচু-নীচুর প্রশ্ন জাগতো না; সমস্তই লীন হয়ে যেতো। বিভেদ সন্দেহ ভেদপূর্ণ ডাকের ভিতর দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আপন করে নিতো! সেই ডাক সেই মিলন; সেই আদর্শ আজ কতদূর?

পাগলটা বল্লো—এস বাবু! এত কথা বললেন ক্ষুধাই বেড়ে যাবে। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে গেছে, এবার সেইদিকে চলুন।

এদিকে গাঁয়ের সাধু তার আশ্রমে হঠাৎ পড়ে যায়। আর মাটির উপর পড়ে ছটফট করতে থাকে। শিষ্যেরা ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। কেহ জল আনে; কেহবা বাতাস করতে থাকে, কেহ শরীর মালিস করে দেয়। কিন্তু সাধু নিষেধ করে, বলে আমার কিছুই দরকার নেই। এই তো ভাল হয়ে গেছি। কিন্তু ভাবি "কি দুষ্ট ছেলে", মিছিমিছি আমাকে আঘাত করলে। শিষ্যরা বল্লো—সাধুজী! কি হলো।

সাধু—কিছুই নয়; একটু চোট লেগেছিলো।

শিষ্য—আমরা দেখলাম; আপনি হঠাৎ পড়ে গেলেন।

সাধু—যারা ব্যথা দিয়েছে তারাই সারিয়ে দিবে। তোরা ভয় করিস কেন?

শিষ্য—সে কি এখানে তো কেহই আঘাত দেয় নাই।

সাধু—বা-রে। সে যে অনেক দূর এক খেলার মাঠে। পরে জানবি।

পরদিন মাঠে ক্যাম্পবাসীদের মধ্যে দুই পক্ষের ফুটবল খেলা সুরু হলো। স্বপুর আর রূপনের ভিন্ন ভিন্ন দল। কিছুক্ষণ জোর খেলা চল্লো। কেহই কোন পক্ষে গোল করতে পারে না। হঠাৎ একটা সুযোগ পেয়ে স্বপু একটা গোল বিপক্ষ দলকে দিয়ে দিল। তাদের দলের আনন্দের ভারে রূপন ক্ষেপে গেল। কিছুক্ষণ পরই কার যেন আঘাতে স্বপু পড়ে গিয়ে হাত মুচকে ফেলে। ছেলেরা ধরাধরি করে শিবিরে নিয়ে এলো। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে দিল। অধ্যক্ষ দুঃখ করে বল্লেন—কি সুন্দর খেলাটা জমে উঠেছিলো। যত সব দুষ্ট ছেলে মাটি করে দিলো। কবে এদের সুমতি হবে কে জানে?

নির্জ্জন একটা ঘরে স্বপুকে রাখা হলো। ব্যথায় চুপ করে ঘুমিয়ে থাকতে না পারায়; ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদেই নিদ্রাদেবী তার পাশে এলো। বন্ধুরা একে একে দেখে বিদায় নিলো। সব শেষে পাপড়ী বসে রইলো।

সে চেয়ে দেখলো তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ব্যথায় কত কালো হয়ে গেছে। কোথায় আগের স্বপু আর আজকের স্বপু। একটুকু ও ভাববার সময় পেলো না। পরক্ষণেই ঘুমের ঘোরে ডেকে বল্লো—একটু জল চাই। নিকটস্থ একজন রক্ষক জল আন্‌তে যাচ্ছিলো; তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গ্লাসে করে খাইয়ে দিলো। এমন সময় একজন অধ্যক্ষ বলে আস্‌ছিলো যত সব নচ্ছার ছেলে জুটেছে আমাদের এই কলেজে। সব বকাটে হয়ে গেছে।

পাপড়ী—কি হলো স্যার ?

অধক্ষ্য—আর কি হবে, তোমাদের ঐ রূপন সেই ধাক্কা দিয়ে স্বপুর ঐ অবস্থা করেছে।

পাপড়ী—কি করে বুঝলেন।

অধ্যক্ষ—সে অন্য একটি ছেলের কাছে বাহাদুর সেজে বলছিলো; দিয়েছি এক লেঙ্গ স্বপুকে। এক আঘাতেই কাত হয়ে গেছে, এবার গোল করার মজাটা বুঝে নিবে।

পাপড়ী—স্যার সত্যই সে এতদূর নেমে যেতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।

অধ্যক্ষ—যাই হোক, তোমরা বন্ধু মানুষ একটু দেখাশুনা করো। আমি একটু কাজে যাচ্ছি। এমন সুন্দর ছেলে হয় না। যেন গোবরে পদ্ম ফুল।

অধ্যক্ষ চলে গেলেন। পাপড়ী তার ঘাম মুছাতেই সে

জেগে উঠ্‌লো। [illegible] পাপড়ী। ভেবে বল্লো—সত্যই তুমি কি [illegible] পাপড়ী। তাই ঠিক করতে পারছি না। কি [illegible] ভাষা খুঁজে পাই না।

পাপড়ী—[illegible] ডাকবেন।
তা [illegible]।

স্বপ্ন—[illegible]।
পারি [illegible] না [illegible]।

পাপড়ী—[illegible]।

স্বপ্ন—[illegible] কিন্তু ভাবছি
কি করে [illegible]।

পাপড়ী—[illegible] কেদিন
[illegible]।

স্বপ্ন—[illegible]।

পাপড়ী—[illegible]

স্বপ্ন—[illegible] আজ [illegible] আর [illegible] আমার ভাল
লাগে। [illegible] রশ্মি দূর
দিগন্তের [illegible] ডুবে যায় তখন
মনে কি অপূর্ব আনন্দেরই না সাড়া দিয়ে যায়।
তারপর যখন জোছনা তার চাঁদ মুখখানি নিয়ে পূর্ব্ব
গগণে উদিত হয় তখন আর এক আনন্দের জোয়ার

এনে দিয়ে যায়। তখন মনে হয় যেন এক দৃষ্টে সেই-দিকে চেয়ে থাকি আর সমস্ত হৃদয়ের ব্যথা ভুলে যাই।

পাপড়ী—তবে কি আলো জ্বালবো না?

স্বপ্ন—না থাক। স্রষ্টা যে আলো দিয়েছেন তাতেই যথেষ্ট। যদি বেঁচে থাকি তবে কালই প্রভাত রবির রশ্মি দেখতে পাবো।

পাপড়ী—মরবার এত সখ কেন?

স্বপ্ন—পৃথিবী যে আমাকে চায় না, তাদের ভার সে যে গ্রাহ্য সইতে পারে না। তাই সে শেষ বিদায় তার বুকে নিতে চায়। এই বলে স্বপ্ন ঘুমাবার চেষ্টা করলো।

পাপড়ী—স্বপ্নবাবু! স্বপ্নবাবু! ঐ দেখুন কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

স্বপ্ন—ভেবেছিলাম কল্পনার স্বপ্ন নিয়ে ঘুমোবো, এরই মধ্যে বাস্তব এসে গেল। তাই তো আশ্চর্য্য বোধ হয়। সত্যই কি মধুর জোছনা। গঙ্গার এই মৃদুমন্দ হাওয়া, এ স্থানে এ পরিবেশ সত্যই অবাক করে দেয়। কবি না হলেও কবির ভাব এসে যায়। বসন্তের কোকিলের গানের সুর না থাকলেও এসে পড়ে। মনে শান্তি না থাকলেও শান্তি আনে। প্রাণে আনন্দ না থাকলেও আনন্দ আনে। সবচেয়ে ভাল লাগে যখন নিশিথের চাঁদ প্রতিফলিত হয়ে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর পড়ে দুলতে থাকে আর চিক্ চিক্ করে রূপালী রূপ

ধারণ করে। ধরণী গম্ভীর হয়ে ঘুমায়ে চলে। রজনীর নিস্তব্ধতা প্রাণে জাগে। অজানা ক্রন্দন বাঁশীর সুরে কাঁদে। সেই আনন্দ যে না অনুভব করেছে সে ছাড়া আর কেহ জানে না। হ্যাঁ! একবার একটু ধরে বসিয়ে দিলে সন্ধ্যায় গঙ্গার দৃশ্যটা আর একবার প্রাণ ভরে দেখে নিতাম।

পাপড়ী—কাছে যখন আর কেহ নেই। এতো আমারই কর্ত্তব্য।

স্বপু— ও-কি বড্ড ব্যথা। উঃ এখনও গেল না। কবে যাবে কে জানে?

পাপড়ী—ডাক্তার বলেছে ও কিছুই নয়, ভাল হয়ে যাবেন।

স্বপু— ডাক্তারেরা যারা মরবে তাদেরও আশা দেয়; যে ভাল হয়ে যাবে।

পাপড়ী—থাক্ ও সব অলক্ষণে কথা। তার চেয়ে বরং যেথায় চোট্ লেগেছে; ব্যথা আছে সেখানে নয়; আইও ডেক্সটা মেখে দেই একটু ভাল বোধ হবে।

স্বপু— সত্যই তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য। কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো খুজে পাই না।

পাপড়ী—শুধু বন্ধু হিসাবে দেখলেন আর কিছু নয়? বন্ধুত্ব ছাড়াও এ আমার কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম মনে করি। যখন কলেজে অন্য বন্ধুরা আপনার নিন্দা করে তখন সত্যই আমার দুঃখ লাগে।

স্বপু— তা জানি। যদি একটা প্রাণ থাকে তবে তা তোমার।

পরদিন ভোর বেলায় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর আর স্বপন ! স্বপন ! বলে ডাক্‌ছে। পাপড়ী ঘর থেকে এসে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলতেই দেখে নিশি। স্বপু ডাক্‌লো —কি নিশিদা কি খবর। এখানে কি করে এলে।

নিশি—এই তো দাহু তোমার খবর নিতে এলাম। কিন্তু তুমি হাত ভাঙ্গলে কি করে ? সত্যি করে বল দেখি কে কি করেছে ? দেখবো কার এত বড় স্পর্দ্ধা তোর গায়ে হাত তোলে।

স্বপু— এমনিই পড়ে গিয়েছিলাম।

নিশি—তা আমি জানি। তুই বন্ধুত্বের জন্য মিথ্যে বলবি। প্রাণ দিয়েও তার ক্ষতি চাইবি নি।

স্বপু— তুমি যে একগুঁয়ে সর্দ্দার যদি বলি তবে তো তাকে আস্তো রাখবে না। যাক কলিকাতার কলেজ হোষ্টেল অনেক ঘুরে বুঝি এখানে এলে। তারপর কলিকাতা কেমন দেখলে ?

নিশি—রাখ্‌ তোদের কলকাতা। সারাদিন ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ হৈ চৈ রব। কল কারখানায় ভর্ত্তি। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটুকু বাঁচবার আশা সেখানে নেই। তোদের সেখানে বন্ধ হাওয়ায় থেকে অভ্যাস; আমরা বাবা ও সব পারি না। পাড়া গাঁয়ের মিষ্ট হাওয়া পেলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

স্বপু— তারপর বাড়ীর খবর কি ?

নিশি—সে তোমার বাবা মার ঝগড়া শুনে কি হবে ?

স্বপ্ন—তা তো জানি। ওদের ক্ষণে ঝগড়া আবার মিল। তা'না হলে সংসার চলবে কেন ?

নিশি—কিন্তু তোমাকে বাড়ী এ অবস্থায় যেতেই হবে।

স্বপ্ন—আচ্ছা তা'পরে হবে। এখন তুমি আমার খাবারটা গিয়ে খেয়ে নাও তো।

বাসু—ওরে স্বপ্ন! এযে দেখছি আমাদের কলেজের প্রথা এখানেও চল্‌ছে। সেই যে তুই না থাক্‌লে আমি তোর মাছের ভাগ নিয়ে নেই। মনে আছে ?

নিশি—কিন্তু বাবা আর যাই কর বিয়ের বেলায় তা করো না।

স্বপ্ন—তা কি হয়। কিন্তু জানকি এই দুর্দ্দিনে খাবার নষ্ট করে লাভ নেই। তাতে আমাদেরই ক্ষতি। যদি সে হোটেলে খায় তবে-তো এখানে খাবার আমার নষ্ট হতো। কারণ আমি খেতে পারতাম না। পাপড়ীর খাবারও রয়ে গেছে। দু'জনের খাবারেই ওর হয়ে যাবে।

বাসু—ও সে তো গ্রামের মানুষ। আমাদের মত পাখীর খাবারে তো তার চলবেনা।

নিশি চলে গেল।

পাপড়ী বল্লো—কি আশ্চর্য্য! বুড়ো তোমার জন্য ও কাঁদে। কত দুঃখ করে।

স্বপ্ন—তা হবে না, ছোট বেলা থেকে সে-ই কোলে কাঁধে করে

আমায় মানুষ করেছে। তা ছাড়া আমাদের পল্লীর উন্নতির মূলে ওঁর আছে অনেক দান। পূর্বে আমাদের গ্রাম ছিল একটা ভয়ানক জঙ্গল। দিনে ছিল চোর ডাকাতের আড্ডা। আজ যদি সেখানে যাও দেখবে কত তার উন্নতি হয়েছে। যে পল্লী ছিল এক সময় জঙ্গল আজ যেন সে শহর হয়ে চলেছে। সেখানে বাস করতো একমাত্র শৃগাল, আর আজ সেখানে বাস করে মানুষ, কত তার পরিবর্তন। পৃথিবী যে কালের সাথেও পরিবর্তনশীল তার যদি কোন উৎকৃষ্ট প্রমাণ থাকে তবে আমাদের সেই পল্লী। তাই ভাবি কালের কি গতি। আমার বাবা ওদের সাহায্যেই ওদের উন্নতি করে সেখানে গড়েছে এক নয়া পল্লী, যদি কোনদিন যাও তবে দেখবে আজও তার রয়েছে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন।

-ধ্যক্ষ ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করে স্বপ্নর কাছে এলেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন—কি স্বপ্ন, এখন কেমন আছো।

স্বপ্ন—মোটামুটি ভালই আছি। কিন্তু বাবা একজন লোক পাঠিয়েছেন বাড়ী যাবার জন্য। সঙ্গে পত্রও পাঠিয়েছেন! যেতে পারবো কি?

ডাক্তার—কিন্তু শরীর নিশ্চয়ই ব্যথায় দুর্ব্বল। তা ছাড়া এত হাঁটাহাঁটি কি ভাল হবে। যদি নেহাত প্রয়োজন হয় তবে সাবধানে যেতে পার।

তারপর হাত বাঁধা অবস্থায় স্বপু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। পথে রূপনের সঙ্গে দেখা।

রূপন—কি স্বপু! ক্যাম্প ছেড়ে যাচ্ছ না কি ?

স্বপু—কি আর করবো ভাই। বাবা লোক পাঠিয়েছেন; যেতেই হবে।

রূপন—আচ্ছা! এই লোকটী কে ?

পাপড়ী—ইনি আমার নিশিদা। তিনি আজই এসেছেন কিনা; এ জন্য আর তাকে পূর্ব্বে দেখেন নি।

রূপন—বাঃ! আপনিও দেখছি কম ঠাট্টা জানেন না।

পাপড়ী—ঠাট্টা কি আপনার এক চেটিয়া নাকি ? আবার ভয় হলো নাতো ?

ওদের শরীর খুব মজবুত। কাজ করতে করতে পাকা হয়ে যায়। ওদের স্পর্শ করলেও পরশ হয়ে যাবেন।

রূপন—না, বাবা! যে রকম শরীরের গঠন; তা হ'লে আর বাঁচবো না।

রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছুতেই দেখলো স্বপুর বাবা সেথায় দাঁড়িয়ে। স্বপুকে দেখেই জড়িয়ে ধরলো কোলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলো—তুমি জানলে কি করে বাবা ? আর এখানে এলেই বা কি করে ?

বিশ্বনাথ—তোর খবর গ্রামের একজন লোকের মুখে শুনে থাকতে পারলাম না। ছুটে চলে এলাম দেখতে।

তারপর গাড়ীর হুইসেল পড়ে গেল। সবাই বিদায় নিলো কিন্তু পাপড়ী গাড়ীর কামরায় চট্ করে উঠে বসলো। অধ্যক্ষ

বল্লেন—পাপড়ী! শীঘ্র নেমে এসো, গাড়ী ছাড়বার আর বিলম্ব নেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাড়বে। শীগ্গীর নেমে পড়।

পাপড়ী—স্যার, আমি বলেছিলাম ওদের বাড়ী যাবো। তা ছাড়া পল্লী দেখি নাই কিনা। পল্লী দেখার বড় সাধ। তাই আমি লোক মারফৎ বাবাকেও জানিয়ে দিয়েছি।

অধ্যক্ষ—কিন্তু তোমার বাবা যদি আপত্তি জানান।

পাপড়ী—তাতে কিছু হবে না। তা ছাড়া যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং দায়িত্ব বোধ আছে। তাতে ভয় কি? বাবা কিছু বলবেন না।

অধ্যক্ষ—সে যে গ্রাম দেশ। বাঘ, ভালুক, এবং আরও কত রকমের ভয় আছে! থাকবে কি করে? তুমিতো সহরের মেয়ে।

পাপড়ী—তা আমি সবখানেই মানিয়ে চলতে পারবো বলেই যাচ্ছি। অজানা বলেই তো জানবার আগ্রহ বেশী তার জন্য কষ্ট হলেও তাতে আনন্দ আছে।

তারপর দ্বিতীয় বাঁশীতে ট্রেণ ছেড়ে দিল। পাপড়ী ও স্বপু রুমাল দেখিয়ে বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানালো। বিশ্বনাথ অধ্যক্ষকে নমস্কার জানিয়ে বসে পড়লো। এখানে গাড়ী যখন দূরে চলে গেল, ততক্ষণ ক্যাম্প বন্ধুরা ঘরে ফিরেছে। এমন সময় ভুতু ও তার বন্ধু রূপণের মন খারাপ দেখে বল্লো—

"আশা রেখ মনে, দুর্দ্দিনে কভু,
নিরাশ হয়ো না ভাই,
কোনদিন যাহা পোহাবেনা হায়,
তেমন রাত্রি নাই।"

গাড়ী হু হু করে ভূতের মত তীব্র বেগে গ্রামের পর গ্রাম কাটিয়ে চলে যেতে লাগলো। আকাশের মেঘ একের পর এক দূরে চলে গেল। সুন্দর নীল আকাশের উদয় হলো। সারা দিন-রাত গাড়ীর জানালার পাশে বসে পল্লী মায়ের রূপ দেখে কাটিয়ে দিলো। আর বল্লো—প্রকৃতির এমন রূপ আর কোন দিন দেখিনি। তারপর গাড়ী যাত্রীদের ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে স্থানে স্থানে পৌছে দিয়ে শেষ গন্তব্যস্থলে বিশ্রাম নিলো।

যখন ষ্টেশন ছেড়ে স্বপ্ন্ বাড়ীর দিকে চলছে তখন বল্লো—

"হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়—
দিনান্তে নিশান্তে শুধু,
পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়"

তারপর সুরু হলো গাঁয়ে যাবার ছোট্ট একখানি পথ। আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে তাদের যাত্রা হলো সুরু। পথের দু'ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত। যতদূর দেখা যায় দিগন্ত বিস্তীর্ণ তার সীমা। পথের ধারে গাছের ছায়ায় দু'এক জন তাদের সেইদিকে চেয়ে কি ভাবছে। কেহ বা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে; কেহ বা উদাস হয়ে অন্যমনস্ক হৃদয়ে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করছে; যতই অগ্রসর হচ্ছে কোকিল মধুর

সুরে হৃদয় আনন্দে ভরে দিচ্ছে; মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ আর মুক্ত মাঠ তাদের মুক্তির পথ খুজে দিচ্ছে।

পাপড়ী বলে উঠলো—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য? প্রকৃতির কত রূপ। কত নির্জ্জন আর মুক্ত, কল্পনারও অতীত। সত্যই কোলাহলময় সহরের বদ্ধতায় যারা আবদ্ধ তারা পল্লীর নির্ম্মল জীবন ও প্রাণময় সহৃদয়তা কোথায় পাবে? আমাদের দেশের যে এত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তার পরিচয় এখানেই পেলাম।

স্বপ্ন—প্রথম ভালই লাগবে কিন্তু শেষে কিছুদিন বাদে আবার কোলাহলময় জীবনের দিকে পথ চেয়ে থাকবে। সত্যই নয় কি?

পাপড়ী—থাকবে, ভাল লাগবে। যাবই না।

বিশ্বনাথ সবার পিছনে আসছিল। আর স্বপ্ন ও পাপড়ী সবার আগে পাশা পাশি চলছিল, সে বল্লো—কি হলো? তোমরা বাড়ী যেতে না যেতেই যে ঝগড়া আরম্ভ করে দিলে।

পাপড়ী—এ রকম ঝগড়ায় আমরা বেশ অভ্যস্ত। কলেজে প্রায়ই হয় তাতে ভয়ের কিছু নেই। হাতাহাতি বা মারামারির ভয় নেই।

বিশ্বনাথ—যাক্ তা হলেই ভাল, তা হলেই হলো। ঐ তে আমাদের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে; এসে গেলাম বলে।

পাপড়ী—দেখছি বেশ সুন্দর। যতই কাছে আসছি ততই

সুন্দর বোধ হচ্ছে। আচ্ছা, ঐ বুঝি বাগান। কি সুন্দর ফুল ফুটে আছে। ঐ যে লাল হয়ে আছে সেটা কি?

স্বপু—তুমি একটা বোকা! ওটা শিমূল গাছ। ওর যখন ফুল ফোটে, তখন মনে হয় যেন সারাটা গাছেই কে যেন সিন্দুর মাখিয়ে দিয়েছে। পাতা ঝ'রে যায় আব ডাল পালা সমস্ত গাছ জুড়ে লাল ফুল ফুটে উঠে। দূর হতে ভারী সুন্দর দেখায় আব একদম লাল রংয়ের। মনে হয় যেন লাল মুকুট পরে আছে। সেই রক্ত রাঙ্গা দৃশ্য সত্যই দেখবার মত।

পাপড়ী—তাইতো চেয়ে দেখছি কিন্তু তাই বলে কি বোকা বলতে পার? সব মানুষ কি সব জানে? আর সবাই তোমার মত দিগ্‌গজ কি।

স্বপু—হ্যাঁ! তা ঠিক তোমার যে টাকা আছে আমার তা' নেই। আমার যে গুণ আছে তোমার তা' নেই আবার তোমার যে গুণ আছে হয়তো তা আমার নেই। না তুমি ভয়ানক চালাক। যাক্ ঐ যে কুটীর দেখছো সেটা এই দীন-দরিদ্রের; আর তার পাশেই স্কুল। মা বুঝি ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। নিকটে আসতেই দেখলো শান্তি গাছে উঠে আম খাচ্ছে।

স্বপু ডেকে বল্লো—কিরে শান্তি, ওকি করছিস্? আম চুরি বুঝি।

শান্তি—না স্বপুদা! মাকে বলেই উঠেছি। তুমি দাঁড়াও তোমাকেও দেবো।

স্বপু—কি-রে! তোর বিয়ের খাবারটা কি আম দিয়েই শোধ দিবি নাকি?

শান্তি—না স্বপুদা! তুমি বড় নির্লজ্জ।

নেমে এসে পাপড়ী ও স্বপুকে দু'টি বেশ বড় বড় গাছ-পাকা আম দিলো।

পাপড়ী বল্লো—সদ্য গাছ পাকা বোধ হয় এই প্রথম। যাক্ তোমার সুন্দর একটা বর আসবে আশীর্ব্বাদ করি সুখী হবে।

শান্তি—সে কি তোমার বুঝি আসবেনা।

পাপড়ী—যা গুরুজনের কথা বলতে নেই।

শান্তি—তবে আমায় বল্লে কেন? তাই আমিও বলবো।

বিশ্বনাথ এসে বল্লো—গৌরী ওদের জল খাবার এনে দাও। মেয়েটীর নাম পাপড়ী। যেমনি সুন্দর তেমনি ওর নাম। স্বপুর সঙ্গে কলেজে পড়ে। বেড়াতে এসেছে, খুব ভাল মেয়ে।

গৌরী—বেশতো এ ভাবে তোমরা এলে কত যে আনন্দ পাই ভেবে পাই না।

পাপড়ী—আপনাদের কষ্ট দিতে আসছি।

গৌরী—না, আমার বেশ ভাল লাগে, বরং তোমাদেরই কষ্ট হবে।

পাপড়ী—আপনি ভাববেন না। কোন কষ্টই হবে না।

শান্তি—আমারও বেশ ভাল লাগে।

গৌরী—কি রে, তুই দেখি এরই মধ্যে ভাব করে ফেল্লি।

পাপড়ী—ওরা কচি, সরল। ওদের সঙ্গেই তাড়াতাড়ি ভাব হয়।

স্বপু—জান মা! কলেজে ঝগড়া বাধলে পাপড়ী আমার পক্ষ হয়ে বলে।

গৌরী—সে তো ভাল কথা। তখন তোর পক্ষটা খুব জোর হয়, তাই না!

পাপড়ী—না! মা! সে মিথ্যা কথা বলে।

গৌরী—অনেক পথ হেটে এসেছ। জল খাবার দিচ্ছি খেয়ে নাও, পরে আবার ঝগড়া কোরো। এই বলে অনেক লাড়ু, মুড়ি এনে দিতেই পাপড়ী খেতে স্বরু করল্লো। খেয়ে বল্লো—সত্যই তো বেশ লাগে। আপনারা আমাদের চেয়ে শান্তিতে আছেন। এই রকম টাট্‌কা খাবার; মুক্ত হাওয়া পেয়ে কারা না সুখী হয়।

গৌরী—যে যে ভাবে সুখী হয়। সে সে ভাবেই সুখী।

এ দিকে সাধু খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত। সে ডাকলো—ও বিশ্বনাথ কি ব্যাপার! এত লোক কিসের?

বিশ্বনাথ—এই তো ক্যাম্প থেকে স্বপুকে আর তার বন্ধুকে নিয়ে এলাম। ওরা দেখছি স্নানের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। চল যাই, বারান্দায় গিয়ে গল্প স্বল্প করা যাবে।

সাধু—তাই চল—তবে জান কি ? মেয়েটাকে আমারই বড়ই ভাল লাগছে। খুব মানাবে কিন্তু। যাক, সে কথা পরে হবে। স্বপু বুঝি এসেই ছেলেদের সঙ্গে পুকুরে গিয়েছে।

বিশ্বনাথ—আর সে কথা বলো না।

গৌরী—পাপড়ী ! ছেলের কাণ্ড দেখ। জল খাবার খেয়ে না খেয়েই ছেলেদের নিয়ে চলে গেছে পুকুরে।

পাপড়ী—ভাল সাঁতার জানে বুঝি, তা চলুন না ; আমরাও যাই। সহরে থেকে পুকুরে কি করে স্নান করে জানিই না।

গৌরী—আচ্ছা চল ! আমিও যাচ্ছি, এই বলে দু'জনে পুকুরের পাড়ে গিয়েই দেখে ; ছেলের দল আর স্বপু পুকুর এপার ওপার হচ্ছে। স্বপু কাছে এসে বল্লো—বড্ড হাপিয়ে গেছি। জোর শ্বাস আসছে।

পাপড়ী বল্লো—বাঃ আপনি দেখছি সাঁতারও বেশ জানেন।

স্বপু—সে কি—তোমার মত মাকে ধরে স্নান করতে হবে ? পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের প্রাণ আছে, তাদের মাটি আর জল বাতাসের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশী। তোমাদের মত কৃত্রিম পাখীর খাঁচায় বাস করে না। জাল জুয়াচুরির ও ধার ধারে না, সরল জীবন যাপন করে।

পাপড়ী—সত্যই যে পল্লী ছিল কল্পণায় বিভীষিকা সে আজ কত ভাল লাগে। মুক্ত হাওয়া, মুক্ত প্রাণ, কত আনন্দ, কত পরিবর্ত্তন ভাবতেও পারি না।

স্বপু—বেশী পরিবর্ত্তন শুভ লক্ষণ নয়। জানতো সবুরে মেওয়া ফলে।

গৌরী—স্বপু! স্নান ও খাওয়া হয়ে গেলে একটু বিশ্রাম নিবে, তারপর মন্দিরে সাধুর কাছে ওকে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিবে।

স্বপু—যো হুকুম তাই হবে।

পাপড়ী—আপনাকেও আমার সাথে যেতে হবে।

গৌরী—সে কি করে হয়, আমার যে ঘরে অনেক কাজ আছে। তা ছাড়া ভয় কি স্বপু সঙ্গে থাকবে।

পাপড়ী—যদি দুষ্টমি করে বা ফেলে রেখে চলে আসে তখন হারিয়ে যাবো।

গৌরী—আচ্ছা নিশি সঙ্গে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা তারা ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ বাতাসের দোলের সাথে দোল দিয়ে দিয়ে মন্দিরে পৌঁছলো। আরতি সুরু হয়ে গেছে। পল্লীর ছেলেমেয়ের দল যুবা-বৃদ্ধ সহকারে সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। কিছুক্ষণ পরে সবাই একত্রিত হয়ে দাঁড়ালো এবং এক সাথে গান গেয়ে সমস্ত সঙ্গীত শেষ করলো। সাধুজি প্রসাদ নিয়ে বিতরণ করতে সুরু করলেন। তারপর স্বপু ও পাপড়ীকে দেখে বল্লেন—তোমরাই না হয় সবাইকে বিতরণ করে দাও।

যখন স্বপুকে ছেলের দল ঘিরে ধরলো তখন শেষ পর্য্যন্ত তাকে সমস্ত লুটের মত করে ছড়িয়ে দিতে হলো। তারপর

ছেলেরা খুব খুসী হয়ে শিব গৌরী কি জয়। সাধুজি কি জয়!- স্বপ্নদা কি জয়, বলে যার যার বাড়ী ফিরে গেল। তারপর স্বপ্ন বল্লো—সাধুজি এই মেয়েটী আমার বন্ধু। খুব ধনবান জমিদারের কন্যা, আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ে।

সাধু—তা দেখেই বুঝেছি আর বলতে হবে না। আর আমার পরিচয় আমি নিজেই।

স্বপ্ন—আচ্ছা! আপনি যে আমাদের ইতিহাস বলতেন তা' বলুন না। সময়টা কাটবে ভাল।

সাধু বলতে সুরু করলেন—স্বপ্নর দাদুর বাবা ছিলেন একজন শান্ত শিষ্ট সাধু প্রকৃতির লোক। আর তেমনি ছিল তাঁর স্ত্রী, তাঁরা এই বনের ধারে প্রাচীন মুনি ঋষিদের মত জীবন ধারণ করতেন। তাঁদের দুটী ছেলে হয়। একটী হয় খুব শান্ত শিষ্ট অপরটি একটু উগ্র প্রকৃতির। সে রীতি নীতি কম মানতেন। লোকে তাকে খুব ভয় করতো, বনবাসী সবাই তাকে সর্দ্দার বলে জানতো। যে কোন বিপদের সম্মুখীন সে হতে পারতো। সে লাঠির জোরে সমস্ত বন শাসন করে বেড়াতো। ক্রমে ক্রমে বন জঙ্গল কাটিয়ে একটী ঘন বসতি পূর্ণ নগর গড়ে তুলেন। দিনে দিনে তার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। তারই ঘরে জন্ম হয় ওর বাবা বিশ্বনাথের। তারপর অনেক পণ্ডিত এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয়েই পরিচয় হয় স্বপ্নর বাবার সাথে আমার।

ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে বন্ধুত্ব। যখন গ্রামের উন্নতি চরম সীমায়, ডাকঘর, বাজার, ষ্টেশন সমস্ত হয়ে গেছে তখন স্বপুর দাদু এক বিরাট শক্তি পূজার আয়োজন করেন। কিন্তু তার পূজায় যখন কোন ব্রাহ্মণ পূজা সমাপ্ত করতো চাইলোনা, তখন স্থগিত করে দিল সে পূজা। দস্যু বলে তার বদনাম দিয়ে তাকে একঘরে করতে চাইল। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী। বৈদিক ব্রাহ্মণ। তিনি তখন বল্লেন—এটী গ্রামের সবার সার্ব্বজনীন পূজা, পূজাটা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি নিজেরই সাধনা করে করতে হয়, তবে পদ্ধতি ঠিক হলো কি না তা দেখবার জন্য একজনের দরকার। যদি কেহ না করে তবে আমি তা করবো। স্বপুর দাদু বল্লেন—যদি আপনি পূজা না'ও করতেন তবে ঐ ফুল চন্দন দিয়ে মায়ের পূজা মনে মনেই সমাপ্ত করে নিতাম। এত টাকা খরচ করবার দরকার ছিলনা। আপনি যখন করেছেন তখন আপনাকে ধন্যবাদ আর আপনার মত লোক যখন পেয়েছি এজন্য আমি একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো। যেখানে সবাই একত্রে হয়ে ভক্তি করতে পারবে আর আপনার মত উদার দেশ প্রেমিক গড়ে উঠবে। ওদের মত গোঁড়া হয়ে উঠবে না।

তাঁরই অনুগ্রহে আজও আমরা এই গাঁয়ের বাসিন্দা।

তারপর তাঁকে জব্দ করার জন্য গাঁয়ের গোঁড়ার দল ধোপা নাপিত বন্ধ করতে থাকে। কিন্তু তার ছিল প্রবল প্রতাপ, সে তার দলবল নিয়ে সমস্ত কুচক্রান্ত ভেঙ্গে দিয়ে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে। জব্দ করার জন্য জমিদার তার লাঠিওয়ালাদের পাঠায় কিন্তু তারাও শেষ পর্য্যন্ত তার লাঠির কাছে হার মানে। তারপর উপায় না দেখে নাম মাত্র খাজনায় সমস্ত বন ভূমি ও পল্লী তার অধীনে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

স্বপুর ঠাকুমাকেও আমরা দেখেছি। তিনিও ছিলেন ভাগ্য-লক্ষ্মী, তাঁর মত মেয়ে সত্যই বিরল। তাঁর চেষ্টায় গড়ে উঠে ঐ সোনার সংসার। আজও দেখবে তার কারু কার্য্যের চিহ্ন; তার স্মৃতি তাদের ঘরে। যখন ওর বাবা ও আমি বিদ্যালয়ে পড়ি— তখন গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় ছিল না ছেলেরা ও মেয়েরা একত্র পড়াশুনা করতে থাকে। তখন বিশ্বনাথ আমাদের বাড়ী যাতায়ত করতো। ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ীর এক মেয়ের সঙ্গে হয় তার ভালবাসা। তেমনি আমারও হয় একজন অন্য ধর্ম্মীয় মেয়ের সঙ্গে অনুরাগ। ধীরে ধীরে জীবনের খেলা হয় সুরু। সেই পুতুল খেলা পরিণত হয় জীবন খেলায়। তারপর আমার বাবা বিয়ের প্রস্তাব করাতে তাদের মধ্যে সুরু হলো সত্যিকারের জীবন। তিনি ছিলেন খুব প্রগতীবাদী, সমাজকে ভয় করেন নি। সমাজ তাকে ভয় করে এসেছে। আজীবন সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তার তুলনায় কিছুই করতে পারিনি।

পাপড়ী—আচ্ছা! আপনার খেলা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর কার্য্য-করী হলো তা তো বল্লেন না।

সাধু—আমার বাবা রাজী ছিলেন অন্য ধর্ম্মীয় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করবার। কিন্তু মেয়ের পক্ষ থেকে এলো না সাড়া। ফলে আজ পর্য্যন্ত আমরা দুজনেই রয়ে গেছি অবিবাহিত। জানিনা মৃত্যুর শেষেও মিলন হবে কি না? আর যদিও হয় তখন জগৎ শুধু মানবতাই ধর্ম্ম বলে মেনে নিবে।

পাপড়ী—আপনিও দেখছি সমাজের বিরুদ্ধে কম লড়ছেন না। সংস্কারহীন গ্রামের ভিতর যে আধুনিক নিয়ম কানুন প্রচলন করেছেন তাতে আপনার দান কম নয়!

সাধু—তাঁরা যে অবস্থায়, যে কুসংস্কার ও যে অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন সে অবস্থার কথা চিন্তা করলে তাঁদের দান, তাদের শক্তি ও সাহসের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তাঁদের অবস্থায় পড়লে কতটুকু পারতাম জানি না। তাদের জীবন ধন্য, সার্থক। আজ সেই তুলনায় আমাদের দান কিছুই নয়। যে রামমোহন সংসার হতে বিতারিত হয়েছিলেন সমাজ সংস্কারের জন্য কত দুঃখ করেছিলেন সুদূর তিব্বত পর্য্যন্ত যাকে দেশ ছেড়ে ছুটতে হয়েছিলো তাঁদের তুলনায় কতটুকু।

পাপড়ী—বলুন দেখি আপনি সাধু হলেন কেন?

সাধু—যখন একজনকে ভালবাসা দিতে পারলাম না, তখন

মনে হলো সেই ভালবাসা ছড়িয়ে দেব সাড়া বিশ্বের কল্যাণে। মনে হলো আমার জীবন এমনি করে নষ্ট হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে যেন অন্য কারোর জীবন এমনি কুসংস্কারে নষ্ট না হয়। তাই দেশ দেশান্তর ঘুরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর পিছু ঘুরে ফিরে এলাম নিজের জন্মভূমির কাজে, উৎসর্গ করলাম তারই কল্যাণে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত বসে আছি তারই সাধনায় তারই উদ্দেশ্যে। ভাবলাম জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই করেই ধরিত্রীর সঙ্গে মিশে যাবো। তাই বিশ্বনাথের সহযোগিতায় ফিরে বসলাম আবার এই মন্দিরে। স্থির করলাম আলোব পর আলোক বর্ত্তিকা বয়ে আলো দিয়ে ভালবাসায় সবার জীবন আমার জীবন সঙ্গিনী করে গড়ে তুলবো—সেখানেই ফিরে পাবো তাকে। যারা প্রগতিবাদী ও উদার তাদের পেলাম সমর্থন। ফলে গড়ে উঠে এই পবিত্র সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান। আজ এখানে শ্মশানের চণ্ডাল ; যারা মানব জীবনের শেষ কার্য্য সম্পাদন ক'রে, শ্মশানে বাস করে সেই স্তর থেকে সুরু করে সকল শ্রেণীর বৃদ্ধ যুবা শিশু এক হয়ে দাঁড়ায় এই প্রতিষ্ঠানে। "সর্ব্বং মথিদং ব্রহ্ম"। তাই স্বীকার করি, ভগবান সব থানে সবার ভিতর আছেন। তাই যদি মানি তবে কেন এ পারবো না। সমাজে এমন যে লোক নেই তা নয়। তবে অনেকে বুঝেও লোক নিন্দার ভয়ে পারে না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে না। আর যাহাদের প্রাণ আছে, যারা উপলব্ধি করে তারা চুপ করে না, নীরবে কাজ করে যায়—জীবন তুচ্ছ করেও এগিয়ে চলে প্রগতির পথে।

পাপড়া—সত্যই আমি আপনার মত মহৎ লোকের সঙ্গে আলাপ করে ধন্য আর অনেক কিছু জানবার ও শিখবার পেয়েছি।

স্বপু—অনেক কষ্ট দিয়েছ তার বদলে শুধু ধন্যবাদ দিয়েই সব চুকিয়ে দিলে, আর কিছু দিলে না? না হয় আর এক দিনের জন্য কিছু রেখে দাও।

পাপড়া—আপনার যে রকম ভাব তাতে বোধ হয় আপনাকে হয় রাঁচী না হয় করাচী পাঠাতে হবে।

স্বপু—না, তা কোনটারই দরকার নেই। করাচী পাকিস্থানের রাজধানী। সেখানে পারমিট লাগে, যাওয়া অসম্ভব। আর রাঁচী যেতে অনেক টাকা লাগে আমার অত টাকা নেই। কাজেই কোনটাই হচ্ছে না। তবে সেটা যদি হয় সে তোমার দয়ায় আর যদি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। কারণ তোমার বাবার অনেক টাকা আছে। তিনি জমিদার মানুষ। এক সই হলেই গাদায় গাদায় নোট হাজির।

নিশি—স্বপু! চল অনেক রাত হয়েছে' ওদিকে মা চিন্তা করবেন।

স্বপু—আরে। মা কখন চিন্তা না করেন? সব সময়ই তাঁকে

হয় কাজে না হয় আমার ভাবনায় বসে থাকেন।

বাইরে এসে দেখলো সত্যই মন্দিরের গায় জোছনা খেলে বেড়াচ্ছে। শুভ্র চাঁদ আকাশে কচি খোকার মত খিল্ খিল্ করে হাসছে, আর কাক যেন তাকে বিদ্রূপ করছে।

জোছনায় মাঠ সাদা হয়ে গেছে, দিগন্তের পল্লীগুলি ধূ ধূ করে জ্বলছে। বন ও ঝোপগুলি ঝিক্ মিক্ করছে। নিশিথের ভরা নদীর বালি পাড়ের মত জোছনা চিক চিক করে কার যেন অতীত স্বপন উদ্ধার করছে। সত্যই অতীত জীবন স্মরণ করে কার মন না উদাস করে ? যখন দিঘির জল বাতাসের দোলায় চিক্ চিক্ করে। শৃগাল দু'একটা মাঝে মাঝে ডেকে পল্লীবাসীর দুপুর রাতের নির্দেশ দেয়। পাখীরা দল বেধে গাছ হতে গাছে উড়ে উড়ে বসে। তখন স্বপু পাপড়াকে বলে—কি পাপড়ার ভয় লাগছে না কি ? এখানে কিন্তু ভূতের ভয় আছে।

পাপড়া—আপনাদের মত লোক থাকতে ভয়ের কি আছে ?

স্বপু—যদি আমরা তোমাকে একা রেখে চলে যাই।

পাপড়া—তা হলে গড়ের মাঠের মত সারামাঠ ঘুরে বেড়াব। আর যদি সাথী পাই তবে তার সাথে চলে যাবো।

নিশি—জান। এটার নাম তেপান্তরের মাঠ। এখানে যে হারায় সে আর বাড়ী ফিরে যায় না। শুধু এদিক ওদিক ঘুরে মরে। দস্যুদল ছাড়া আর কোন লোক বাস করে না।

স্বপু—আচ্ছা যদি কোন গুণ্ডা পথিক সেজে ধরে নিয়ে যায় কেমন করবে ?

পাপড়ী—যদি আপনার মত গুণ্ডার হাতে পড়ি তবে স্বেচ্ছায় যাবো। অবশ্য অন্যের সঙ্গে পালাবো তাতে সন্দেহ নাই।

স্বপু—দেখ পাপড়ী ! তোমার দেওয়া এত খেতাব দিয়ে কি করবো, তাতে যে বিশ্ববিদ্যালয় হার মেনে যাবে।

পাপড়ী—সে কি ?

স্বপু—কেন। কখনও বলছো গুণ্ডা, কখনও গায়ক, কখনও দুষ্টু, কখনও খেলোয়াড়, আবার কখনও বক্তা। তাই ভয় হচ্ছে এবার না আবার কোন নূতন খেতাব দিয়ে বসবে। কিন্তু বাবা ! আর যাই কর দুর্ণাম দিও না।

পাপড়ী—বাবা ! বদনামে ও দেখছি ভয় আছে।

স্বপু—সে ভয় কার না আছে। সবাই চায় ও আশা করে পরীক্ষায় পাশ করতে, কিন্তু ফলে তা হয় না। শেষে দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকে করে গেছে ফেল আর অনেকে পাশ, তাই ভালোমন্দের ভিতর মানুষ ভালোটাই আশা করে। খারাপটাকে সে ফাকি দিতে চায়। তাইতো রাত্রিশেষে অন্ধকার পার হয়ে আলোকের দিকে ধাবিত হয় হাজার হাজার পতঙ্গ মুক্তির আনন্দে স্বেচ্ছায়, প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। ভাবি যে রবীন্দ্রনাথ স্কুল কলেজে পড়েন নাই। আজ দেখি তাঁর পুস্তক সেখানে পড়ান হচ্ছে। সত্যই কি ভাববার বিষয় নয় ?

পাপড়ী—আপনি অনেক বকেছেন, এবার বাড়ী ফিরে চলুন দেখি। আর ঘুরবার সখ নেই।

স্বপ্ন—জান। এই জোছনা রাত আমার বড় ভাল লাগে। মনে হয় গৌতম বুদ্ধের মত এ সংসার ছেড়ে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই।

পাপড়ী—আমি জানি আপনি তা যেতে পারবেন না।

স্বপ্ন—পারবোনা, তবে মজা দেখাচ্ছি, দেখবো তুমি কোথায় পথ ভুলে যাও আর আমরা কোথায় যাই।

এই বলে নিশিকে বল্লো—নিশিদা তুমি এদিকে এসো। তুমি ঐ বনের দিকে চলে যাও। কানে কানে বলে দিল বনের ধারে গিয়ে চুপ করে লুকিয়ে থাক, আমিও কাছে থাক্‌ছি। এই বলে তারা চলে গেল। পাপড়ী একা পড়ে রইলো। আর পায়চারি করতে লাগলো।

হঠাৎ ঝোপে মানুষের সাড়া পাওয়ায় শিয়াল ডেকে উঠলো। দু'একটা দৌড়ে অন্য ঝোপের দিকে চলে গেল। পাখীগুলিও এগাছ থেকে ওগাছে যেতে সুরু করলো। হঠাৎ ঝোপটী নড়ে উঠলো। আর তার ভিতর দৌড়াদৌড়ির শব্দ শোনা গেল। তারপর যখন ভূতের কথা মনে হলো তখন পাপড়ীর শরীর শিহরিয়া উঠলো। নিশিদা, নিশিদা বলে চীৎকারে আকাশ পাতাল সে কাঁপিয়ে তুল্লো।

নিশি তাড়াতাড়ি বের হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলো কোন ভয় নাই। তারপর স্বপ্নকে ডাকলো স্বপ্ন! স্বপ্ন! ফিরে এসো, অনেক শাস্তি হয়েছে আর নয়।

স্বপু এসে বল্লো—খবরদার ও রকম আর বলো না।

পাপড়ী—আর নয়, খুব ঘাট হয়েছে। বাবা! কি দস্যু ছেলে।

স্বপু—ফের ওকথা বলছো, তবে আবার যাবো।

পাপড়ী—না, আব বলবো না। এখন ভাল ছেলের মত ঘরে ফিরে চলুন দেখি।

পরদিন ভোরবেলায় মুড়ি খেতে খেতে পাপড়ী পুকুর পাড়ে এলো। ঘাটের ধারে মাছের ঝাঁক দেখে তাদের মুড়ি খাওয়াবার সখ হলো। তারপর তাদের সঙ্গে তার সুরু হলো খেলা। ইতি মধ্যে স্বপুও তার ভাগেব মুড়ি নিয়ে সেখানে হাজিব হয়ে দেখেছে পাপড়ীর কাণ্ড। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে হঠাৎ বল্লো—কি পাপড়ী! এত লোভ দেখান ভাল নয়। শেষে যে আমাদেরই জ্বালাতন করে খাবে। ঘাটের ধারে কার মুড়িব আশায় পাত পেতে থাকবে।

পাপড়ী—সে কি আপনি যে ভাবে হঠাৎ ডাক দিয়েছেন তাতে দেখছি ভয় পেয়ে পুকুরেই ডুবে যাবার উপক্রম।

স্বপু—ডুবলে ধববার অনেক লোক আছে তা সত্য, কিন্তু যারা বছরের পর বছর ধরে কত পরিশ্রম করে দিনের পর দিন আপন তাগিদে পল্লীর মঙ্গলের জন্য মাটি কেটে গেছে তাদের কথা ক'জনে ভাবে? পল্লীর কল্যাণে নিজেদের রক্ত জল করে যে কঠিন শ্রম করে গেছে তা সত্য হলেও গল্পের মত মনে হয়। যারা দেখেছে তাদে

ছাড়া আর কারো মনে তাদের কথা স্মরণ হয় না। কিন্তু যারা এটা গড়েছে তাদের অস্তিত্ব আজও মুছে যায়নি মনে হয়। আজো যেন তারা নীরবে আপন মনে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছে। প্রগতির সাথে পা মিলিয়ে চলেছে তার অবাধ গতি। মনে হয় আজও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে পল্লীর চারিদিকে ঘুমন্ত অবস্থায় লুকিয়ে আছে পল্লীর বুকে। যখনই আমি আসি তখনই আমার মনে পড়ে, মনে জাগে তাদের কথা; তাদের বিগত স্মৃতি। ভেসে উঠে এই কালো জলের প্রতিচ্ছায়ায় প্রতিটী জল কণায়; প্রতিটী ধূলার সাথে তাদের ছবি।

পাপড়ী—কেন আমি দেখছি আপনার হৃদয়ে ওরা সব জেগে আছে, মরেনি তো।

স্বপু—তা নাই হলো। কিন্তু ভাবছি তুমি কি এটাকে বালিগঞ্জের লেক না বানিয়ে ছাড়বে না? বালিগঞ্জে না হয় রোজ যাত্রীরা যাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছে কিন্তু এই বেচারাদের শেষে যে মুস্কিল হবে। রোজ ওভাবে কে দিবে? থাক আর দিও না; মুড়ির বন করে দিবে দেখছি।

পাপড়ী—সে দেবার লোক অনেক আছে, একজন তার জন্য থাকলেই হয়। তবে যত রকম মাছ দেখছি তাতে লেক না হলেও চিড়িয়াখানা যে বটে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বপু—চিড়িয়াখানার কি দেখলে? এই বিশ্বই যে মস্তবড় চিড়িয়া-

খানা। কত বড় বড়, কত রকম চিড়িয়া দেখেও কি বিশ্বাস হয় না।

পাপড়ী—কেন দেখুন না। কত রকমের মাছ, বুনো হাঁস, ছেলেমেয়েদের রৌদ্র পোহান ভঙ্গি, ছুটাছুটি : বিভিন্ন ধরণের গাছ, তারপর পাখীর কতরকম বাসা আর আমাদের মত ঝগড়া আনাগোনা দেখেও কি অবিশ্বাস করা যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের একত্র হয়ে সরল ভাবে অবাধে মেলামেশা।

স্বপ্ন—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সরল প্রাণ, তাদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ ভেদাভেদের স্থান কোথায় ? সহরে এরকম যতটা দেখা না যায় এখানে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখবে।

পাপড়ী—সহরের কথা ছাড়ুন। আমি জানি পাশাপাশি বাড়ী তাদের সঙ্গে ঝগড়ার অন্ত নেই। এক বাড়ীর ছেলে অন্য বাড়ী যায় না পাছে খারাপ হয়ে যায় বা অন্য কিছু হয়। তারা বন্দী করে রাখে বন্দীশালায়। সেখানে পাশাপাশি বাড়ীর নেই মিল, নেই ভালবাসা, সামাজিক টান ও সামাজিক বোধ। আর সাড়া সহরে হবে কি করে ? যেখানে পর্দ্দা না দিলে জাত যায় ; হাওয়া বন্ধ হয়, দম ফেটে যায় ভিন্ন ভিন্ন থাকতে হয় সেখানে একতা কোথায় ? দুঃখও হয় হাসিও পায়।

স্বপ্ন—আচ্ছা, মনে কর যখন আমরা শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করি

তখন কি আমরা মনে করি বা মনে থাকে যে কোন জাত; কে কোন গোত্র, কে কোন বংশ? তখন সমস্ত থাকে এক হ'য়ে। তখন মনে হয় সমস্ত বিশ্ব জোড়াই তাদের বাড়ী। যখন ধীরে ধীরে বয়স হতে থাকে তখন পিছনে পড়তে থাকে জাতের ছাপ; সুরু হয় শ্রেণী বিভাগ, নানারূপ সঙ্কীর্ণতা, হিংসা-দ্বেষ। তারপর যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখনও ভাঙ্গেনা গোড়ামী, মৃত্যুর খড়্গ যখন মস্তকে পতিত হয় তখন ঘুচে আসে সমস্ত কাঠামো চূরমার করে ধরিত্রীর ধূলার সাথে মিশায়ে দেয় সমস্ত গর্ব্ব-অহঙ্কার, ভেদাভেদ। সেই শ্মশানই হয় এক মানব জাতির পবিত্র তীর্থ ভূমি।

পাপড়ী—স্বপ্নবাবু! সত্যই ঐ সাধুজিকে আমার বড় ভাল লাগে। চলুন না আজকে সন্ধ্যার দিকে আবার সেখানে যাই। ঐ মন্দির আর নির্জ্জন প্রাকৃতিক আবেশে মনে হয় যেন এক ঘুমন্ত ধরণীর গভীর আঁধারে একটী শুভ্র আলোকময় শাশ্বত কলঙ্কহীন প্রদীপ।

স্বপ্ন—সে বলে কি জান? সূর্য্য যখন আকাশে উদিত হয় তখন যেমন পূর্ব্বাকাশ হতে সুরু করে সমগ্র আকাশ ধীরে ধীরে আলোকময় উজ্জ্বল করে তোলে এও ঠিক তেমনি তার আদর্শ! সারা বিশ্ব একের পর এক করে ছড়িয়ে দিবে, এগিয়ে দিবে গ্রাম হতে গ্রামে, সহর হতে সহরে—মুক্তি পথে যেখানে থাকবে না ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি রাজনীতির নামে দুর্নীতি।

তারপর সন্ধ্যা যখন হ'লো, দুজনে নিশিকে নিয়ে চল্লো সেই মন্দিরে। পৌছুতে না পৌছুতেই দেখলো সেই যে তিনটী আসন তেমনি যেন প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের অপেক্ষায়; তাদের আশায়; তাদের জন্য পাতা হয়ে আছে। স্বপ্ন জিজ্ঞাসা করলো সাধুজি! এ যে দেখ্‌ছি সে আসন এখনও পাতা আছে। তা'কি এখনও তোলা হয়নি?

সাধু—না-রে! তোদের খবর পেয়ে এইমাত্র আসন দিতে বল্লাম।

স্বপ্ন—তা তুমি জানলে কি করে?

সাধু—তা'যদি না জানবো তবে এতদিন পড়ে এখানে কি করলাম?

স্বপ্ন—যাক্‌, আজকে আমাদের ইতিহাস একটু শুনাবেন—

সাধু—তবে শুন, যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবনে সব একাকার করে দেয়, তখন তোদের আমাদের কোন বিভেদ ছিল না তোদের যেমন এগার দিন অসুজ, পক্ক পিণ্ড শ্রাদ্ধ ঠিক তেমনি আমাদেরও হয়, তবে তোরা ব্রাহ্মণ কশ্যপ মুনির আর আমরা অন্যের বংশধর। ক্রিয়া কলাপে কোন তফাৎ নেই সবই ব্রাহ্মণের। তারপর জাতিভেদ প্রবল হয় দুর্ভাগ্য বশতঃ। বল্লাল সেন ও তার কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করে আর তোরা গোড়ামী করায় তোদের সমাজ-হীন করে দেয়। তখন সহর ছেড়ে পল্লীতে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয়। চাষ বাস করে

নমশুদ্র বলে পরিচয় হয়, সেই জের আজও যায় নাই। যার ফলে আমাদের দোষে আমাদেরই সংস্কারের অভাবে সেই সমস্ত শম্বুক, একলব্য ও কালাপাহাড়ের সৃষ্টি হয়। তাদের কাহিনী আজও শুনতে হয়; মনে ব্যথা দেয়। সমাজ যাদের গ্রহণ না করে; নিকৃষ্ট বলে ধ্বংসের মুখে দিয়েছে। তা' না করে যদি এক জাতি, এক প্রাণ ও একতার গান নিয়ে অগ্রসর হতে পারতাম তা হলে বোধ হয় আমাদের অনেক উন্নতি হতো আর দেশ অনেক এগিয়ে যেতো। দেশ বিদেশে অশোকের আদর্শ ধারা ছড়িয়ে যেতো। মুক্তির পথ দিকে দিকে খুলে যেতো। বন্যার মত দূর দিগন্ত ভাসায়ে জগৎময় প্লাবন করে যেতো। জগতের ইতিহাসে সমাজ বিপ্লব করে এক নূতন অধ্যায়ের রচনা হতো। যে ব্রহ্মাশক্তি আজ ক্ষত্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সে ছিন্ন-ভিন্ন না হলে তিলে তিলে ক্ষয় না হলে একত্রিত হয়ে গিয়ে কি না করতে পারতো। সমগ্র দেশের এমন কি বিশ্বের এক কল্যাণ সাধিত হতে পারতো। তবু ভরসা আবার বুঝি ফিরে আসবে অশোকের সেই যুগ আর তার সাম্য মৈত্রীর আদর্শ। বিশ্ব প্লাবিত করবে আবার সেই ধারা; দেশের নূতন রক্ত প্রবাহে, নূতন জীবন।

পাপড়ী—কি রহস্যময় ধরণী। আর তার কাহিনী।

স্বপু—আমার তো পৈতে ছিঁড়ে গেছে। তাই ভাবি ব্রহ্মা যখন

সবখানে তখন সবাই ব্রাহ্মণ, তবে পৈতার জন্য ভাবনা কি? গোটা মানুষটাই যদি হয় তবে তারজন্য আর আসে যায় কি?

পাপড়ী—তা-ছাড়া চিনা বামুনের পৈতে লাগে না।

স্বপু—তোমার যে বড় আগ্রহ? কান দেখছি খাড়া হয়ে থাকে।

পাপড়ী—আমার কানটা বড় খারাপ, সব কিছুতেই উৎসুক আর আগ্রহ। সে বেচারা দোকান খুলেই থাকে বন্ধ করতে জানে না।

স্বপু—যাক্ তা' হলেই বাঁচা গেল। সওদার জন্য ঘুরতে হবে না, জিনিষ সব সময়ই পাওয়া যাবে।

এদিকে ক্যাম্প শেষ হয়ে গেল। ট্রেণে যার যার জিনিষ পত্র নিয়ে যাত্রীরা বসলো, গ্রাম্য বন্ধুদের সঙ্গে সবার ফটো নেওয়া হলো, তারা বিদায় বেদনার মধ্যেও আবার আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলো। গাড়ীর হুইশেল হতেই হু-হু করে দৈত্যের মত পা বাড়ায়ে চল্লো। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা গল্প গুজব হৈ-হল্লা সুরু হলো। একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু রুমাল দিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় তাদের বন্ধুদের নিশানা দিলো। তারপর ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে অনেক দূর এলো। কিন্তু কেন হঠাৎ গাড়ী থেমে গেল। কি ব্যাপার! কি ব্যাপার বলে! সবাই নেমে এলো লাইনের ধারে। ইঞ্জিনের কাছে এসে দেখলো একটী কুকুর আর একটী মানুষ কাটা পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করবার পর ড্রাইভার বল্লো—লোকটা মরবার সাথে সাথেই কুকুরও ঝাঁপিয়ে ওর সঙ্গে প্রাণ দেয়! পল্লীবাসীরা ছুটে আসলো, তাদের একজন বল্লো, লোকটা অনেকদিন ধরে কাজকর্ম খুঁজে পায়নি; তা ছাড়া খেতে না পেয়ে কষ্ট সহ্য করতে আর না পেরে জীবন দিয়েছে। তার কুকুরটী ছিল একান্ত প্রভুভক্ত। সেও তাকে ছাড়া বাঁচতে চায় না। তাই সেও তার সঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। যাত্রীরা শুনে ও দেখে অবাক।

বাসু—সত্যই আমরা মানুষে মানুষে ঝগড়া, কাটাকাটি করে মরি। আজ দেখছি ভালবাসার আগুনে কুকুরের ন্যায় পশুও মানুষের বশ হয়। আর মানুষ সে হবে না কেন?

অধ্যক্ষ—ভালবাসা কখন হয় জান? যখন তারা একস্তরে এসে যায়। তখন আপন পর, পশু-মানুষ, কোন ভেদাভেদ থাকে না, সব জয় করে যাওয়া যায়।

বাসু—স্যার! সত্যিই এদৃশ্য যে দেখবে সে মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করতে পারে না।

রূপণ—স্যার! বাসু ভারী সাম্যবাদী। কোন দিন না জানি ওকে নিয়ে বিপদ হয়।

ভুতু—বাসু! সত্য কথায় আজকাল ভাত নেই। ওসব বলো না।

রূপণ—আরে থাম, থাম! দেখছি তুইও ঘোর সাম্যবাদী হয়ে গেছিস।

বাসু—আর যাই বল আগুনকে ধামা চাপা দিতে পারবে না। সে জ্বলে উঠবেই। যেমনি এ ক্ষয়ে ক্ষয়ে জ্বলে যায়, তেমনি এই কৃত্রিম ভেদাভেদ একদিন যাবেই।

গাড়ী অনেক দেরী করে ষ্টেশনে পৌছলো, কেহ গাড়ী, কেহ ট্রেক্সী, কেহ ট্রাম, কেহ বা বাসে করে যার যার গন্তব্যস্থলে পৌছে গেল। পরদিন রূপণ বিকাল বেলায় ভুতুর বাড়ী পৌছলো, তাকে বল্লো—চল ভুতু! পাপড়ীদের বাড়ী যাই। ওর বাপ আমার বাবার বন্ধু। আমাদের দেখলে ভারী খুসী হয়। আর বড্ড খাওয়ায়। তা ছাড়া ওদের মস্ত বড় একটা লাইব্রেরী আছে, চল যাই।

ভুতু—আর যাই বলো ঐ লাইব্রেরীর উপরই আমার লোভ

বিরাট তেতালা বাড়ী, নানা রংয়ের আলোকে সন্ধ্যায় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করেছে তার শোভা! মনে হয় সমস্ত দেহের রক্ত যেন মুখে উঠে মুখখানি রক্তিমাভ করে দিয়ে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। জাক্-জোমক আর লোকজনের আনা গোনায় সবাই ব্যস্ত। পাখীর খাঁচায় বিভিন্ন রকমের পাখী, তাদের সেবায় কেহ বা ব্যস্ত হয়ে আছে, তা' ছাড়া আর তার কোন লক্ষই নাই। সম্মুখের বাগানে নানারূপ ফুল ও ফলের গাছ; বাড়ীর শোভা বৃদ্ধির জন্য কয়েকজন ব্যস্ত, তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। ভুতু আর বই দেখে থাকতে পারলো না, বইগুলি দেখে দেখে আশা নিবারণে ব্যস্ত। মস্তবড় হল ঘর; আসবাবপত্র প্রচুর। নানা দেশের নানারূপ পুস্তকে সারি সারি সাজানো লাইব্রেরী।

একটুবাদে পাপড়ীর বাবা এলো সেই ঘরে। রূপণকে দেখেই বল্লো—কি-হে! পাপড়ী বুঝি এলো না। বল্ দেখি কি ডান পিটে মেয়ে। কোথায় কি করে? না দেখা করে চলে গেল। ভুতু বল্লো তার জন্য ভয় কি?

রূপণ—তুমি বইয়ের তালে আছ তাই থাক। এসব সামাজিকতা বুঝবে কি? গ্রাম দেশ, কিছু সে সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা নেই। কত বিপদ আপদ হতে পারে; তা' ছাড়া গিয়াছে এক ছোট লোকের বাড়ী, যারা সমাজে হেয়, তুচ্ছ, জঙ্গলী।

বাসু ঘরের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিলো, তারপর শেষ হতেই এসে বল্লো—কি কাকাবাবু! কি কেমন আছেন?

রতিন—না, তেমন ভাল নেই! পাপড়ীকে নিয়েই যন্ত্রণা। এক মেয়ে সেও যদি কথা না শুনে, আজে বাজে ছেলের সঙ্গে চলাফেরা করে তবে কি ভাল লাগে?

রূপণ—ছেলেটাই যত নষ্টের মূল। পাপড়ীর কোন দোষ নেই ওকে শায়েস্তা করা দরকার।

বাসু—পাপড়ী ভাল মেয়ে এবং বুদ্ধিমান। সে যা করে বুঝে শুনেই করে। তা' ছাড়া ছেলেটী ভাল বলেই জানি ওদের গ্রামও অনেক উন্নত হয়েছে। কোন জিনিষ সব সময় এক রকম থাকে না, কালের পরিবর্ত্তণে সব পরিবর্ত্তণ হয়, তাছাড়া সে গাঁয়ের লোকেরা

সবল, সৎ ও বিশ্বাসী। তাদের কাছে জাল, জুয়াচুরি নেই, পরস্পরের সহযোগিতা সত্যই অদ্ভুত ওরা দেশের সত্যই খাটী মাটির মানুষ আমাদের সহরের মত কৃত্রিম নয়।

রূপণ—আচ্ছা, চলুন গেলেই বুঝতে পারবেন। এদের মত ছেলেরাই আমাদের সমাজটা ডুবাবে।

বাপ্পু—বিশ্ব সমাজ তো ডুবেই আছে, ভাসলো কবে? শুধু জলে নয় বায়ুতেও ডুবোই। আজ যদি একটী লোক পথে দাঁড়ায় তখন কি, সমাজের কেউ বা সমাজ রক্ষা বা সাহায্য করবে? আমার তো মনে হয় তখন তার নিজের পা'য়েই দাঁড়াতে হবে।

লক্ষ লক্ষ লোক খেতে পায় না পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় সমাজ, কোথায় সেবাসঙ্ঘ যারা তাদের স্থান দিচ্ছে। আজ আছে শুধু সমাজ শাসনের বাইরের খোলস; সত্যিকারের প্রাণ কোথায়? আজ যদি ধর্ম্ম মানতে হয় তবে তা শুধু মানবতা। তাকে ভিত্তি করেই নূতন সমাজ গড়ার প্রয়োজন। যাদের আপনি জঙ্গলী বলেন যাদের শায়েস্তার জন্য এত অর্থ খরচ করছেন, তা'না করে যদি তাদের উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠান করে তার পিছনে যদি খরচ করেন, তাতে মনে হয় আপনার নাম ও তাদেরও অনেক উন্নতি হয়। যেখানে প্রতিবেশী কেবল দুঃখী সেখানে কোন প্রতিবেশীই সুখী হতে পারে না

যতক্ষণ না অন্য প্রতিবেশীকে সুখী করতে পারছেন। তাদের সুখী দেখলে নিজের ও আনন্দ হয়, সুখীও হওয়া যায়। আর সবাই যদি দুঃখী হয় আপনি শুধু সুখ করতে থাকেন তখন হবে সাহারা মরুভূমির মধ্যে যেন একটী রস-হীণ খেজুর বৃক্ষ। সেই দুঃস্বপনের রাজ্যে দুঃখ ছাড়া সুখ হয় না। এই বলে সে চলে গেল।

রতিন—আচ্ছা রূপণ! ছেলেটার নাম কি?

রূপণ—আজ্ঞে! স্বপন।

রতিন—আবার সাধ করে কানা ছেলের নাম রাখা হয়েছে পদ্মলোচন। আচ্ছা! ওর বাপের নাম কি?

রূপণ—শুনেছি তার নাম না কি বিশ্বনাথ।

রতিন—বুঝেছি। আর বলতে হবে না, এ-কাজ বরদাস্ত করা চলবে না। কালই চল্ পুলিস্-পেয়াদা লোক-জন নিয়ে। জানিস্ না, ওরা আমাদের জমিদারীর ঘোর শত্রু। চিরকাল বে-দখল করে এলো। খাজনা না দিলেই বাঁচে। আমাদের গণ্যই করে না। এবারের সুযোগে শায়েস্তা ভাল ভাবে করবো। যত সব চোর বা দুঃখীর ডাকাত মিলে কলোনী করে বসেছে, যত সব বাজে।

তপতী—পাপড়ীকে এবার এনেই পাত্রস্থ করে ফেল, তাহলেই তো চুকে যায়। অনর্থক ঝগড়া করে লাভ কি?

রূপণ—একটু বিনীত হয়ে বল্লো আজ্ঞে আপনার মেয়ের পাত্রের অভাব কি?

পরদিন সকালবেলা স্বপু ফুল বাগানে বেড়াচ্ছিল। তারই কাছে পাপড়ীও এসে চুপে চুপে তার গান শুনছিলো আর ফুল ছিড়ছিলো। ঝোপের আড়াল থেকে হাত বাড়ায়ে ফুল তুলতে যাওয়ায় হঠাৎ কাঁটা ফুটে যায় আর লাল বিষের পিপড়ে কামড়ায়, দুদিক থেকে জব্দ হয়ে চীৎকার করে। স্বপু দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বারান্দায় তুলে নিয়ে ঔষধপত্র দেয়। ওদিকে ধনী লোকের মেয়ে তাই সবার ভাবনা হলো, কিন্তু তারপর চাইতেই সবাই হাফ ছেড়ে বাচলো।

স্বপু বল্লো—চালাকি করে ফুল তুলছিলে, দেখ এবার মজা। তোমাদের মত বাগানের মালী না থাকলেও আমাদের বাগান রক্ষকের কি রক্ষক নেই।

পাপড়ী—থাক যথেষ্ট হয়েছে। আর ঠাট্টা করতে হবে না। কেন আমাকে একা রেখে ঘুরছিলে আর গান গাইছিলে।

স্বপু—ফুল সুন্দর হয়ে ফুটেছে কি না তাই তাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও কোমনীয়তা উপভোগ করছিলাম।

পাপড়ী—তাই বুঝি উদাস ভাব।

স্বপু—কিন্তু কেন দুষ্টামি করতে গেলে আর আমাদের ভোগালে।

পাপড়ী—থাক্ তা' আর বলে কাজ নেই।

স্বপু—আচ্ছা! বিকালে চল যাই পাশের গ্রামটায়। তাদের অবস্থা দেখে আসবে।

তারপর নিশিকে সঙ্গে করে তারা চল্লো সেইদিকে। বাড়ীর পর বাড়ী ঘুরে স্বপু বল্লো—দেখ এরা দিন আনে দিন খায়; কেহ বা অনাহার অর্দ্ধাহারে দিন কাটায় তবু বিধাতা এদের মুক্তি দেয় না। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, তবু পেটের দায়ে মিলে দিন মজুরী যোগাতে হয়, নতুবা দিনের পর দিন ধরণী বুকে বিশ্রাম নিতে হয়। এদের খবর ক'জন নেয়; ক'জন রাখে।

পাপড়ী—সত্যই এদের খবর জানতামই না যা কল্পনার চোখে দেখেছি আজ তা বাস্তব দেখ্ছি।

স্বপু—আজ দরকার এমন এক কর্ম্মীদল যারা এদের পৌছে দিবে আলোয়। মিথ্যার বেড়াজাল ভেঙ্গে আনবে বাস্তব সত্য; বাচবার উপায়, মুক্তির পথ, তাই ভাবি যারা রৌদ বৃষ্টি সহ্য করে দেশের খাদ্য যোগাচ্ছে সমাজের সেবা করছে প্রাণ বাঁচাচ্ছে তার পরিবর্ত্তনে আমরা তাদের করি ঘৃণা, অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনা। পদে পদে আঘাত খেয়ে সমাজে অপদস্থ হয়ে হয় ধর্ম্মান্তর। অথচ যারা ভাল বাস্তো প্রাণ দিয়ে, হাসি মুখে নিয়ম কানুন, অনুষ্ঠান করে যেত তারাই লাঞ্ছিত হয়ে দূরে সরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবু তাদের ধরে দেখা যায় তাদের সেই নিয়ম কানুন দেখে ভারতবাসী আফ্রিকার কালো বলে নিগ্রো অবমানিত নানা ছাপ চিহ্ন যখন চোখে মুখের স্মৃতি

পরিচয় করে তখন ভাবি তাদের জন্য আজ দায়ী কারা ? আমরা কি সবাই ? তাই মনে হয়, তাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সাহায্য ও সহযোগিতা; কিন্তু তা' কত দূর ?

পাপড়ী—তাই আজ [illegible] সমাজ সংস্কার না করি তবে কি করে আফ্রিকায় আমরা সংস্কার দাবী করবো। আমেরিকা ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে নিগ্রো সমস্যার সমাধান করবো। না সমাজের শ্রাদ্ধ করে ছাড়লে আর টেকা যাবে না। এপার ওপার হতে হবে।

স্বপ্ন—তোমাকে যেতে হবে না। নিজেই এসেছে। থাক্ এখন চল বাড়ী যাই। দুজনে বাড়ী পৌছেই দেখে পুলিস্, পেয়াদা আরও সর্দার লোকজন।

পাপড়ী—বাবা! তুমি কখন এলে ? হঠাৎ কি করে এলে ? তা' এত লোকজন পুলিস্ কেন ?

রতিন—তোমার প্রায়শ্চিত্ত করবো বলে।

নায়েব—স্বপন! তোমার বাবা কোথায় ?

স্বপ্ন—তিনি স্কুলে আছেন। কিন্তু আপনারা দেখ্ছি যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন। তবুও যাক্ আপনাদের দয়া যে এই দুর্গম গিরি পথে আমাদের মত জঙ্গলী পাড়ায়; জঙ্গলে দর্শন দিয়েছেন যে জমিদার বাবুকে জীবনে একবারও দেখি নাই গ্রামে; তাই ভাবছি

আমাদের কত সৌভাগ্য তিনিও আজ এসেছেন। এতে কম দয়া নয়, তাতেই আমরা ধন্য। আপনাদের মত শক্তিশালী বৃক্ষশ্রেণীর সাহায্যেই তো আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল বৃক্ষলতা উঁচে আরোহণ করছি, তা না হলে কবে জানি প্রলয়ের কোলে বিশ্রাম নিতে হতো; পৃথিবীর ঘূর্ণি-পাকে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গিয়ে তার বুকে মিশে যেতে হতো। ভাবছি সহস্র যুগের অন্ধকার ভেঙ্গে যেতে চলেছিলো, আলোর পূর্বাভাষ চোখে লাগছিলো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার বুঝি আমাদের ভাগ্যাকাশে মেঘ নেমে আসছে। ভয় হয় পাছে সেই স্থানে না ফিরে যাই। আপনারা আলোকপ্রাপ্ত নগরীর জীব আর আমরা পল্লী-অন্ধকারে। তাই তো বহু ভাগ্যবলে আপনাদের দর্শন পাই, আবার কখনও ভয়ে ডুব দিয়ে থাকতে হয়। তাই ভাবি এবার কি প্রভাত না সন্ধ্যা ঘনায়মান? তাই দেখছি গাছগুলি জল, আলো ও তাপ চায়, ধরিত্রীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। তাই ভাবি এবার বুঝি আমাদের প্রতি দয়া হলো। কিন্তু এবার মুখের বাণী জল হয়ে গোড়া ভিজাবে না ডুবাবে? তাই ভেবে কিনারা পাচ্ছি না?

রতিন—এরই নাম বুঝি স্বপ্ন?

রূপণ—আজ্ঞে হাঁ!

রতিন—দারোগা সাহেব একে নিয়ে চলুন।

স্বপু—আমার অপরাধ ?

দারোগা—আপনাকে তার মেয়েকে আনার জন্য, এই দেখুন—ওয়ারেন্ট।

স্বপু—মাকেই জিজ্ঞাসা করুন সে স্বেচ্ছায় কেন এসেছে।

পাপড়ী—বাবা! তুমি একি করছো। আমি যে তাদের অতিথি, স্বেচ্ছায় এসেছি ; দেখবার জন্য, তাদের কোন দোষ নেই, সব আমার।

দারোগা—এ অবস্থায় সত্যই বেআইনি কাজ হবে।

রতিন—অরূপ বাবু! আইন আমরাই তৈরী করি আবার আমরাই ভাঙ্গি। আপনি শুনুন ভাল হবে।

স্বপু—দারোগাবাবু চলুন, আমি যাচ্ছি। ইতিমধ্যে সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে গেল। কিছুদূর যেতেই দেখালো পথে গাছ পড়ে আছে, মটর থেমে গেল। গ্রামের পথের দু'ধারের ঝোপ থেকে সদ্দারগণ দল বেঁধে ঘিরে দাঁড়াল।

বিশ্বনাথ বল্লো—ভাল চান তো স্বপুকে ছেড়ে দিন, নয়তো সবার প্রাণ লাঠির ঘায়ে আর তীর বর্শার মুখে যাবে।

রতিন—আমাদের বন্দুক দেখছো।

বিশ্বনাথ—ক'টা গুলি আছে। আর কটা প্রাণ যাবে তারপর যখন গুলি থাকবে না তখন সব এ কচু কাটা হয়ে যাবে।

অরূপ—স্বপুকে ছেড়ে দিতে পারি কে ইতু, সোজা নয়।

রতিন—না সে দোষী ; ছাড়বেন না।

বিশ্বনাথ—নিশি ওকে তুলে নিয়ে আয়।

স্বপু—না বাবা ! তুমি ওদের নিয়ে অনর্থক রক্তপাত করো না।

বিশ্বনাথ—স্বপ্ন ! সে বাংলা এখনও মরে নাই। তার লাঠি আজও জীবিত, ভয় পেয়ো না, সাহসী হও, তুমি নির্দ্দোষ। ওদের হার মানতেই হবে। যে লাঠির ভয়ে পর্ত্তুগীজ দস্যু তস্কর পর্য্যন্ত হার মেনেছে—সে আজও আছে। একজন গেলে দশজন দাঁড়াবে। তবু অন্যায় মানবো না।

নিশি—স্বপ্ন ! না আজ শুনবো না। কেন তোমাকে অপমান করলে ? আমরা সহ্য করবো না। এই বলে সে তাকে গাড়ী থেকে নামায় ও জনতা নিয়ে চলে যেতে থাকে।

দারোগা টানাটানি করে। রতিনের ইঙ্গিতে জনৈক পুলিশ গুলি ছাড়ে। নিশি গুলি খেয়ে পড়ে যায়। তারপর নিশি আবার উঠে বর্শার আঘাতে তাকেও শেষ করে দেয়। নিমিষের মধ্যে দুই দলে মারামারি সুরু হলো। উভয় পক্ষে রক্তপাত হলো। স্থানে স্থানে হতাহতের করুণ ক্রন্দন সুরু হলো। স্বপু ও পাপড়ী নিশিকে ধরে নিয়ে যায় এক গাছের কাছে সেখানেই সে প্রাণ হারায়। স্বপু তার বুকে পড়ে কাঁদতে থাকে। রতিন ও রূপন আড়ালে লুকায়ে

সহরের দিকে আতঙ্ক হয়ে পিছু চলতে থাকে। পুলিশের মৃতদেহ রেখে দারোগাও ছুটে পালায়।

সন্ধ্যার সূর্য্য লাল হয়ে পশ্চিমে ডুবে গেল। তার সাথে রাস্তার ধারে সবার মৃতদেহের সাথে নিশিকে সৎকার করা হলো। তার দেহ উজ্জ্বল আলোতে নিমিষে শেষ হয়ে গেল। সবাই দাঁড়ায়ে তাকে শ্রদ্ধা জানালো। বিশ্বনাথ বল্লো, নিশি আমাদের জয় তিলক পরিয়ে গেছে; অন্যায়কে স্বীকার করে নি। পল্লী মা তার এক কৃতি সন্তানকে আজ হারালো; তার আত্মার সৎগতি কামনা করি। তার প্রাণ চিরদিন এই পল্লীর ধূলিতে স্মৃতি নিয়ে অমর হয়ে থাকবে।

তারপর কবির—"সর্ব্বহারা রিক্ত যারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা"

এই গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে গেল। এই দুর্ঘটনা কাগজে কাগজে ছড়িয়ে গেল। সরকার দমনের জন্য কারফিউ জারী করে এবং উপদ্রুত বলে ঘোষণা করে।

হঠাৎ একদিন দুপুর রাতে অতর্কিত আক্রমণ করে স্বপ্ন ও পাপড়ীকে পুলিশ ধরে নিয়ে আসে সহরে। তারপর রতিন তার মেয়েকে নিয়ে আসে তার বাড়ী। আর স্বপ্ন জেলে চলে যায়।

রূপণ—এবার আপনার সর্দ্দারগণের বাহাদুরি কোথায়? লাপসী খেয়ে আসুন কিছুদিন।

স্বপ্ন—তা' কাপুরুষের মত দুপুর রাতেই সহজ, সেইদিনের

ঘটনাই কি এর প্রতিউত্তর দেয় না। তা' ছাড়া দয়া করে শ্বশুর বাড়ী পাঠাচ্ছেন, তা যাবো, তাতে ভয় কি? কিছুদিন না হয় বেড়িয়ে আসবো। এতো আপনাদের কম দয়া নয়?

মস্তবড় কোর্ট; লোকের আনাগোনা। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুই পক্ষই হাজির। উকিলবাবু মোহন মাষ্টারের ছাত্র, সে বল্লো—স্যার! দুঃখের কথা কি বলবো, আজ আমরা এক ধর্ম্মীয়। তা' ছাড়া একই দেশের এক মাতার সন্তান; যুগ যুগান্তর যেথায় বাস করে এলাম তবু ভেদাভেদ হিংসাদ্বেষ গেল না। খৃষ্টান সমাজ বয়স্ক ছেলেমেয়েদের এই ব্যাপার নিয়ে মোটই মাথা ঘামায় না। তাদের সমাজে এটা অঙ্গ এবং তারা উদার। তাদের আইন স্বীকার করে। কিন্তু আমাদের গোড়ামি গেল না, একভাবে না পারলে দশভাবে তাকে জব্দ করতে চাই। তাই তারা মেয়েকে দিয়ে না পারায় শেষ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনা বলে কম্যুনিষ্ট নামে তাকে জড়ান হয়েছে। জানি না কতদূর কি ফল হবে? সত্যই এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে।

বিশ্বনাথ—মোহন! সত্যই কি বলবো তুমি তো সবই জান। এই সমাজের অবিচারে অত্যাচারে কত লোক ধর্ম্মান্তরিত হয়ে গেছে, অপমান দুঃখে আত্ম বিসর্জন দিয়েছে, ভেদাভেদ হিংসা দ্বেষ যুগ যুগান্তর ধরে চলছে তবুও তার অবসান হলো না। কবে হবে কে জানে?

জানি না তাদের কথা তাদেব জন্য কত জন ভাবে।
তারা হয়তো ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধরণীর ধূলায় আজও লুকায়ে আছে। আর না হউক দেশমাতা তাদের ইতিহাস ভুলে যায়নি, তার স্মৃতি তার বক্ষে এখন জাগ্রত হয়ে আছে। তাই ভেবেছিলাম বাপ, ঠাকুরদা অনেক কষ্ট করে এক নগব গড়েছেন; জীবনের শেষ দিনগুলি আনন্দেই কাটবে। দুঃখ কষ্ট অনেক গেছে কিন্তু এ দেখছি সারা জীবনটাই তার মধ্যে কাটবে, তাই ভাবি কবির কথাই সত্য

"বিধাতা যাবে দেয় অলৌকিক আনন্দেব ভাব,

তাব বক্ষে বেদনা অপার।"

মোহন—আপনি ভাববেন না। মোকদ্দমা টিকবেনা। কারণ তার কোন দোষই প্রমাণ হবে না। সে নির্দ্দোষ। সে মুক্তি পাবেই।

কিন্তু ফলে দেখা গেল, ডাক্তার জোর করে মেয়েকে নাবালিকা প্রমাণ করলেন। আর রাজনৈতিক ঘটনা বলে তাকে শেষ পর্য্যন্ত জেলেই থাকতে হলো।

মোহন—মাষ্টার বাবু! আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু টাকার গরমে ওরা সব উল্টে দিলে। তাই আজ সব-চেয়ে সত্য টাকা। তা'ছাড়া আর এমন সত্য বলে জগতে কিছুই নেই।

জনতা—আমরা তাকে জোর করে খাল'স করে নিয়ে যাবো।

সমস্ত ভেঙ্গে চূরে একাকার করবো। এ অন্যায় সহ্য করবো না ; এ অন্যায় মানবো না।

মোহন—এখন কোর্টে গোলমাল করলে আবার এক রক্ত-পাতের সূচনা হবে। তা'না করে উপরে আবার আমরা আপীল করবো। তখন ঈশ্বরের কৃপায় মুক্তি হবেই।

জনতা—না! এতবড় সত্যতা প্রকাশ পেলো না। আমরা ঈশ্বর মানি না। বাস্তবকেই স্বীকার করবো এ চিরকাল দেখে এলাম তাব নয়।

সাধু—আজ মনে পড়ে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সেই কথা :—"শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।"

কিন্তু আজ যদি সেই কবি ফিরে আসতেন তবে বলতেন :—"শুনহ মানুষ ভাই,

সবার উপরে টাকা সত্য

তার উপরে নাই।"

তার সত্য, তার কথা আজ যে কত বড় মিথ্যায় পরিণত হয়েছে তা' ভেবেই পেতো না। আমরা সমাজ সংস্কার ; দেশ উদ্ধারের নামে দেশ উন্নত করার নামে কল্পনায় মশগুল কিন্তু বাস্তব রূপ কোথায়? মানুষের মর্য্যাদা মানুষে দিতে শিখলো কোথায়? আজ যে

দেশে প্রয়োজন ব্যাপক সমাজ বিপ্লব, ঘরে ঘরে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, তার বাচবার উপায়, তার শিক্ষার বন্দোবস্ত ; রাজনৈতিক চেতনা আর অর্থনৈতিক মুক্তি। সে দেশের কল্পনার স্বপ্ন ভাঙ্গবে কবে ? কবে বাস্তবে পরিণত হবে কে জানে ?

স্বপ্ন—মনে হয় যেদিন মানুষ থাকবেনা।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সাধু মোহনের বাড়ী গিয়ে বল্লে—মোহন ! আমি স্বপ্নর সঙ্গে একবার দেখা করে এদেশ থেকে বিদায় নেব। যেখানে শুধু থাকবে বনভূমি ; সবল প্রাণের নিজ্জন সৌন্দর্য্যের প্রাকৃতিক আবেশ। যেখানে মানুষ, পশু পাখী বিরাজ করে এক সাথে—তাদের নিয়ে আবার বাচবো নূতন করে। গড়ে তুলবো আর এক নয়া সমাজ। এই আঁধার সমাজে আর রক্ত দিব না। অনেক মহাপুরুষ অনেক রক্ত দিয়েছেন তবু তার কালিমা ধূয়ে গেল না। সে রেখা এমনি বুঝি গভীর ; যুগ যুগান্তরেও তা গেল না। জানিনা আরও কত রক্তের প্রয়োজন।

মোহন—শুনতে পেলাম স্বপ্ন এবং আরও অনেকে সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ সুরু করেছে। আহার বন্ধ করে শরীর খারাপ করে ফেলেছে। আচ্ছা চলুন ! ওকে একটু বুঝিয়ে যাবেন। ডাক্তার না কি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত, আশঙ্কা পাছে কি হয় তাই উদ্বিগ্ন।

জেল কর্ত্তার হুকুম নিয়ে সাধুজি এলেন জেল কামরায়।

সে চুপ করে শুয়ে আছে। চেহারা রুক্ষ হয়ে গেছে। উস্কো খুস্কো তার মুখ আর চুল। না খেয়ে শরীর ভেঙ্গে গেছে। সাধুজি ডাক্ দিলেন স্বপ্ন। স্বপ্ন।

স্বপ্ন—সাধু। আপনি সাধু। সত্যই চোখ বিশ্বাস করছে না। মনে হচ্ছে যেন কোন এক মহান দেবতা, মহাপুরুষ।

সাধু—তোর সাধনা তুই করে যা' ভয় পাবিনি। মুক্তি হবেই। তোদের সমাজ সামনে নূতন করে আসছে। ওদের সমাজ ভেঙে দেবার জন্য নয়। যে শিশু জেগে ঘুমায় তাকে যেমন জাগান না জাগান সমান : জাগান কষ্টকর তেমনি যে সমাজ জেগেও ঘুমন্ত তাকেও বলা না বলা সমান। আমি আর এখানে থাকবো না। ভবিষ্যতের আশা নিয়ে অনেক দূর চলে যাবো।

স্বপ্ন—আমিও তাই চাই।

সাধুজি—বিদায় তো সবাই নিবে। দুদিন আগে আর দুদিন পরে। কিন্তু দুঃখ এই তা' কেহ জেনেও জানে না সেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। ভয় হয় যে হিন্দুত্ব সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের জন্য সমগ্র মানব জাতি গ্রহণ করতে পারবে। তা বোধ হয় কালে কালে এ বিশ্ব থেকে লোপ পেয়ে যাবে। পড়ে দেখিস স্বর্গীয় প্রফুল্ল সরকারের "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"। বোধ হয় তার উজ্জ্বল প্রমাণ। যাক্, সত্যকে আশ্রয় করে শিবের নাম নিস্ তাহলেই সব সফল হবে। শান্তি আসবেই, মরণ-জয়ী হতে পারবি।

স্বপ্ন—না ওতে আর বিশ্বাস নেই।

সাধু—তা রোজ একটু অভ্যাস করলে দেখবি নিজেই তোর সামনে ভেসে উঠবে। মনের ভিতর ছাপ পড়ে পড়ে ফুটে উঠবে। যাক্ আমি চল্লাম ; এ সমাজ এ মানুষের কাছ থেকে দূর হতে দূরান্তর পানে।

তার পর গৈরিক বেশ দুলিয়ে চলে গেল দূরে। যতদূর দেখতে পায় স্বপ্ন চেয়ে থাকে। অশ্রু এসে চোখ রুদ্ধ করে দেয়। ঝাপসা হয়ে গেল। আর একবার চোখ মুছতেই দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

স্বপ্ন—ভাবলো ! আব বল্লো ! একি সত্য না দুঃস্বপ্ন ! এই দ্বন্দ্বে উদাস করে দিল তার প্রাণ। আকুল হয়ে দূরে আকাশ পানে চেয়ে থাকে। মেঘের পব মেঘ আসছে দুরন্ত বন্যা নিয়ে। মনে হলো যদি এদেব মত মেঘ হতে পারতাম। যদি পাখী হতে পারতাম তবে বোধ হয় মুক্ত আকাশে মুক্তি নিয়ে অবাধে চলাচল করতে পাবতাম। ঝবণাব জল আর বনের ফল খেয়ে নির্বিঘ্নে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পাবতাম।

এদিকে পাপড়ীও তাব বাড়ীতে উপোস্ করে পড়ে আছে। উস্কো খুস্কো তার চেহারা আর বেশ ভূষা আর চুল। অসুস্থ দেহে বিছানায় পড়ে। দুশ্চিন্তায় তাব চোখে মুখে কালিমা পড়ে গেছে। ভাবছে জীবন কি ছিল আর কি হলো। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে সে কল্পনাও করে নাই। বিশেষ করে তার

বাবার উপর কোন শ্রদ্ধাই আর তার রইলো না। এত যে গোঁড়া হবে সে কখনও ভাবে নাই। তার মা' তপতী বিছানার পাশে বসে আছেন আর বলছেন, লক্ষ্মী মা, খাবারটা খেয়ে নাও। কিন্তু তবু চেষ্টা বিফল হচ্ছে।

পাপড়ী—কেন মা! আমি তো তোমাদের বাড়ীর অলক্ষ্মী মেয়ে। এবার দূর করতে পারলেই বাঁচ। তাই না।

তপতী—ছিঃ মা! ও কথা বলতে নেই।

পাপড়ী—কেন আমার বাবা তো আমাকে তাই বলে।

তপতী—সবই বুঝিরে। কিন্তু তার গোঁড়ামির জন্য চলতে সাহস হয় না।

পাপড়ী—তুমি তো জান, ইংরেজ জাতির ইতিহাস। ওদের দেশে কত জাতির আক্রমণ হয়েছে। যার ফলে আজ তারা শুধু শক্তিশালীই নয়। সাহস এবং জ্ঞান-গরিমায় সব দিক থেকে ওরা কত বড়। ভেবে দেখ যে ভূমিতে নানা নদীর পলিমাটি পড়ে সে ভূমির উর্বরা শক্তি না হয়েই যায় না। "মনে পড়ে তাই কবি এই দুর্ভাগা দেশকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।—

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে॥

জেনে রাখবে এ ছেলে খেলা নয়। মানুষের জীবন মরণের খেলা। আজ দেখছি সবাই চাকরী করছে

অধিকাংশই সেবা করে। তাই তো বৈদিক প্রথানুযায়ী সবাই শুদ্র হয়ে যায়। আর যারা শিক্ষিত, জ্ঞান আছে তারাই ব্রাহ্মণ। তাই আজ যারা উন্নত, শিক্ষিত কেন তাদের মর্য্যাদা দিবে না। নূতন যুগ নূতন সমাজ আসবেই, সময় কাহাকেও ক্ষমা করবে না, মহাকাল ক্ষমা জানে না। তার কাছে সবাই হার মানে। তার গতি পথে সবার বিবর্ত্তন। রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। জানি না তোমাদের ভুল কবে ভাঙ্গবে।

রতিন এলো ঘরে; বল্লো কেমন আছে! তপতী বল্লো—যে রকম হাল হয়েছে তাতে এর বিয়ে দেওয়া দূরে থাকুক তার জীবন নিয়ে টানাটানি স্বরু হবে। যা হয় একটা মীমাংসা করে ফেলো।

রতিন—আমি যা করি বিবেচনা করেই করি। বাজে কথা বলো না, মুস্কিল হবে। এই বলে চলে গেল।

তপতী—দেখলে পাপড়ী! একটু বল্লেই সাপের মত ফোঁস করে উঠ্‌বে। তারপর সংস্কারের কথা বল্লে—সে বলবে "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কি দরকার ?

পাপড়ী—জান মা! এ দেশ আমাদের। যদি উন্নতি হয় তবে আমাদেরই আনন্দ আর তা' না হলে আমাদেরই দুঃখ, দুর্ণাম। আমরা যদি এ কাজ না করি তবে অন্যে করবে কেন। আমাদেরই স্বরু করতে হবে সবার সহযোগিতা নিয়ে আমাদেরই সফল হতে হবে। একজন দশজনকে

শিখালে একজন অন্ততঃ একজনাকেও যদি আলোক দিতে পারে তবেই অনেক হয়ে যায়। দেশ উদ্ধার হতে কত-দিন লাগে ?

মঙ্গলু এসে বল্লো—মা! একজন ভদ্র মহিলা এসেছেন! আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তপতী—তাকে উপরে নিয়ে আয়।

গৌরী উপরে এসেলো, পাপড়ী হাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লো মা! আমাকে ক্ষমা করো। আজ আমার জন্য তোমাব কত কষ্ট।

গৌরী—যা ঘটবাব তা ঘটেছে। তাতে কি আছে। তুমি ভাল হয়ে নাও। শুনেছি স্বপ্নও না কি সত্যাগ্রহ সুরু করেছে, তাই আজ দেখতে এসেছি।

কথা শুনে পাপড়ীর মুখ শুষ্ক হয়ে গেল। লজ্জায় দুঃখে তার সমস্ত শরীর বিষণ্ণ হয়ে গেল। বিষাদের ছায়া সারা দেহে নেমে এলো। চোখ আরও কালিমায় ভরে গেল। অন্য দিকে মুখ ফিরায়ে অশ্রু মুছে নিলো। একদিকে ক্ষুধা অন্যদিকে দুঃখের জ্বালা। তাই মুখ বুজে কাঁদা ছাড়া আর কিছুই রইলো না।

গৌরী—না' মা! ছি! কাঁদতে নেই যা হবাব হয়েছে। তুমি ভাল হয়ে নাও। এই বলে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

তপতী—সত্যই আপনাকে যেন পবিচিত বলে মনে হয়।

আপনাকে দেখে বড়ই ভাল লাগে। স্নেহ মমতায় সত্যই আপনি অপূর্ব্ব।

গৌরী—তবে শুনুন। আমি এই জমিদার বংশেরই একজন। সম্পর্কে এরা আমাদের আত্মীয়। কিন্তু আমরা ছিলাম প্রগতিবাদী আর এরা ছিল গোঁড়া। এরা যখন অর্থ-লোভে এক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে তখন আমি ভাল বাসতাম আমার এক বাল্য সাথী স্বপ্নর বাবাকে। বিয়ের দিন আমার বাবা এদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমার সাথীর সঙ্গে দেয় মিলিয়ে। তিনি জানতেন আমাদের তুজনকেই। বাল্যকাল থেকে এক সাথে খেলা-ধুলা পড়া-শুনা করে মানুষ হই। তাই যে মর্য্যাদা দিয়েছিলো ভালবাসার। আজ যারা এইরূপ জীবন নষ্ট করে তারা সমাজের দেশের সব চেয়ে বড় শত্রু। তাদের শাস্তি হয় না, শাস্তি হয় নিরীহ শান্ত ব্যক্তিদের। আজ এই তো দেশের নিরপেক্ষ বিচার নীতি। যাবা দেশের, সমাজের উন্নতি চায়, সংস্কাব করে বাঁচতে চায়, দেশকে ভালবাসে তারাই যায় জেল খানায় আর যারা সমাজের দেশের অনিষ্ট করে তারাই নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করে বেড়ায়। দেশকে ভালবাসার এই পরিণাম। মানবতার স্থান কোথায়? ভেবেছিলাম ভেদাভেদের খাঁচা ভেঙ্গে চলে যাবো মুক্তির পথে মুক্তির আনন্দে আর ফিরবো না, জানিনা কেন আবার বিধাতা ডেকে

পাঠালো। ভাবছি ঐ তো দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ফটো। কিন্তু ক'জন তাদের কথা মানি, তাদের আদর্শ পালন করি; তাদের কথা শুনি। যারা পালন করে তারাই দুঃখী। তাই দেখি সেই শ্রেণীর দুঃখী বড় কম।

হঠাৎ রতিন ঘুরে এসে বল্লো—মঙ্গলু দু'তালায় কে যেন কথা বলছে।

মঙ্গলু—আজ্ঞে একজন ভদ্র মহিলা।

রতিন—কোথায় বাড়ী! কি নাম? যাক্ তুই খাবার নিয়ে আয় আমি যাচ্ছি দুতালায়।

দুতালায় এসে দেখে গৌরী পাপড়ীর কাছে বসে আছে। সে দাঁড়ালো। রতিন জিজ্ঞাসা করলো—এ কে?

তপতী—তোমাদের দুসম্পর্কের আত্মীয়া। স্বপুর মা।

রতিন—হঁা! এতদিন পরে বুঝেছি। কিন্তু যার জন্য আসা তা' হবে না। তুমি ভাল চাও তো বের হয়ে যাও। নয়ত……

গৌরী—আপনাকে আর কাউকে ডাকতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।

পাপড়ী—বাবা! বাবা! এ কি করছো!

রতিন—আমি যা' খুসি তাই করবো। বেশ করছি। চুপ করো। নয়ত……

হঠাৎ তাড়াতাড়ি করে নামতে গিয়ে গৌরী পা ছিটকে পড়ে

যায়। সিড়ি দিয়ে গড়ায়ে নীচে আসে। পাপড়ী বল্লো—বাবা! একি করলে। চীৎকার করে বল্লো, ওঁকে ধর মা! মঙ্গলুকে ডাকো।

মঙ্গলু ছুটে আসে। তাকে ধরে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তপতী ডাক্তারকে ফোন করে দেয়। কিন্তু মাথা ফেটে রক্ত তীরের মত ছুটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। পৌঁছে দেখলো আর আশা নেই। তাই নীরবে শুধু একবার দেখে ফিরে গেল। তপতী চোখের জল মুছে মুছে বল্লো—চেয়ে দেখ কি সুন্দর তার হাসি; এখনও তা' মিলায় নাই, সুন্দর হাসি মুখ খানি শত দুঃখেও একটুও ম্লান হয়নি; সে যেন বিজয়িনী হয়ে ফিরে যাচ্ছে শেষ শয্যায়। কে যেন বলে গেল।

"ছায়া ঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে সর্ব্বশেষ বাঁশরীর সুরে॥"

মঙ্গলুর কাছে মৃত্যু সংবাদ শুনে পাপড়ীও দুতালা থেকে গৌরীকে শেষ দেখা দেখবার জন্য নীচে আসছিলো, দুর্ব্বল দেহ তাই শরীরের ভার হাতে রাখতে পারছিলো না। সকলের অজ্ঞাতে নামবার সময় সেও হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় নীচে। তপতী দেখে চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। রঞ্জিন কোলে করে নিয়ে বল্লো—মা! একি করলে। আমার সত্যই ঘাট হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো। ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সেও অস্ফুট স্বরে বল্লো—বাবা! অনেক কষ্ট দিয়েছি সবই আমার ভাগ্য। এই বলে সেও শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করে চলে যায় ধরিত্রীর বুকে। শ্মশানে দুটী প্রাণীর জীবন শেষ হয়ে গেল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো; সে যেন সারা বিশ্ব নিমিষে নিঃশেষ করে দিতে চায়।

ওদিকে স্বপ্নর মন শরীর ভাল লাগে না, সর্ব্ব দেহ তার আগুনের মত জ্বলে যাচ্ছে চারিদিকে সে অগ্নির নৃত্য দেখছে। হঠাৎ আকাশ ঘোর কাল মেঘে ছাইয়ে ফেল্লো। কাল বৈশেখীর প্রলয় সুরু হলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ ডেকে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। আকাশের এক কোন লাল হয়ে গেল। রুদ্র ভৈরব মূর্ত্তি নিয়ে হাজির হলো শঙ্কর। তীব্র বেগে হাওয়া ছুটলো। চারিদিকে প্রলয়ের ঝড় আর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। গাছ পালা ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। বৃদ্ধ যুবা শিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে সারা পৃথিবী ধ্বনিত হতে লাগলো। বড় বড় অট্টালিকা কম্পনে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো। বিশ্বনাথের তাণ্ডব নৃত্যে চারিদিকে ধ্বংসের ডাক্ প্রলয়ের ধ্বনি ধ্বনিত হলো। নদীতে বাণ ছুটলো, সাগরের জল তোলপাড় করে তীব্র বেগে গড়ায়ে চল্লো। জেলখানা ভেঙ্গে গেল। বন্দীরা মুক্তি পেয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। প্রলয়ের মুক্তি চারিদিক গ্রাস করে ফেল্লো। দিকে দিকে জ্বলে উঠলো বিদ্যুৎ আর আকাশের প্রচণ্ড ধ্বনি। প্রবল বন্যায় আর ঢেউয়ের দোলায় সব একাকার হয়ে গেল। স্বপ্নর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো রুদ্র শঙ্কর মূর্ত্তি আর গৌরী। একে একে সবার ছবি ভেসে উঠে তার হৃদয় সাগরে মুগ্ধ হয়ে মিশে যায়

তাদের রূপ। সাম্যের সামা গানে তার হৃদয় নেচে উঠে দোলায়। অপূর্ব্ব সঙ্গীত দূর হতে দূরে মুগ্ধ করে মিশে যায়। অজানার ডাকে অজানার দেশে।

আগামী দিনের প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল হাসি মুখ ধারণ করে আছে। ভৈরব মুক্তির ঢেউ লেগে শাশ্বত শুভ্র পথপুষ্প ভেসে চলে দিগ্‌দিগন্তে সাগরের এপার ওপারে অজানা কূলে। যতদূর দেখা যায় যতদূর শুনা যায় শুধু ঢেউয়ের দোলার প্রতিধ্বনি। সন্ধ্যা হয়ে এলো কে যেন স্বপ্নের

প্রতিধ্বনি করছে— "ছায়া ঘন সন্ধ্যার তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে মধুর শেষ বাঁশরীর সুরে।"

হঠাৎ তার একটু মোহ ভাঙ্গলো: আবার চেয়ে দেখলো শুধু সাগরের ঢেউয়ের মালারাশি। আন্দোলিত করে যাচ্ছে এপার হতে ওপার আপন মনে। কোথা হতে কোথায় গিয়ে মিশে কেউ জানে না। মনে হলো এই ধরা যে ঘূর্ণনের ফলে যে বিপ্লবের পৃথিবীর সৃষ্টি আবার বুঝি তার কালেই এলো প্রলয়। আবার বুঝি আসলো সাম্য মৈত্রী-শান্তি। আবার কে যেন বলে গেল— "বাসা ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন পার হতে কোন পারে॥"

সমাপ্ত

লেখকের আলোপাত সম্বন্ধে কয়েকটী মতামত:—

দেশ সম্পাদক বলেন:—"কবি নিবেদনে বলিয়াছেন "বৃহৎ বিশ্বের যতটুকু জীবনে উপলব্ধি করেছি আমি তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলাম। কবির পৃথিবী আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে ভাষা ও ছন্দের বন্ধনে............ ...! ১০।১২।৪৯

সোনার বাংলা:—

.........কবিতা গুচ্ছটি লেখকের প্রথম প্রয়াস। লেখক তরুণ, তার উদ্যম প্রশংসনীয় কিন্তু প্রকাশকগণ এই উদ্যমকে সাধনার দিকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করিলে উপকার করবেন।

১১ই শ্রাবণ ১৩৫১ সন।

সত্যযুগ:—'আলোপাত' একখানি কবিতার বই। অনেকে বলেন আজকালকার হাওয়া বাতাস ঠিক কবিতা উৎপাদনের যেন উপযোগী নয়। অনেকে এমন বলেন যে নরম এবং সতেজ কাদা মাটিতে এক সময় কবিতার বীজ হামেশা উদ্গত হয়ে দেখতে না দেখতে আকাশের মুখ চুমো খেতো। আজ সেখানে শুষ্ক কলকারখানা ইট-পাটকেল ঢুকেছে। মনকে ভেঙ্গে চুরে ধুলো মলিন করে তুলেছে। সুতরাং তেমন মন নিয়ে আর যা' হোক কবিতার জন্মদান সম্ভবপর নয়। একথা কতটা সত্য সন্ধানীরা বলতে পারেন। আমরা যারা সাধারণ পাঠক তারা এটা বেশ বুঝতে পারি যে কবিতার মূল্য হ্রাস

হয়েছে এবং বাজারের সাময়িক পত্র পত্রিকাদিতে তা' অনেক খানি দুষ্প্রাপ্য। যারা শিল্পী এবং কবি তারা বোধহয় কালেভদ্রে যা' দুএকটা লেখেন এবং সস্তা দামে ছাড়তে মন সরে না বলে ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে মজুত করেন। বাজারে ছাড়েন দু'একটা সময় এবং চাহিদা ও অর্থনৈতিক রীতি অনুযায়ী। ফলে বাজারে কবিতা নেই·· ···থাকলেও সংখ্যালঘু আর সঙ্গে সঙ্গে নেই পাঠক।·········কবিতা গুলোতে উপলব্ধির বৈচিত্র্য আছে। লেখক প্রকৃতি পন্থী; কবিতার বিষয় বস্তু তার প্রমাণ। ধ্বনির মিলনকে লেখক তেমন স্বীকার করেন নি·········॥ ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৫৬

সচিত্র ভারত, আনন্দবাজার, যুগান্তর ও অমৃতবাজারও উক্ত পুস্তকের সমালোচনা করেন।

প্রাপ্তি স্থান :—

বি সরকার এণ্ড কোং

১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :—

বাংলা বাজার, ঢাকা পূর্ব্ব পাকিস্থান